নব ভারত

অথবা

পরিবর্ত্তনযুগের ভারতবর্ষ।

শ্রীযুত এইচ্. জে. এস্. কটন প্রণীত
'নিউ ইণ্ডিয়া' নামক গ্রন্থের অনুবাদ।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক
অনুবাদিত।

কলিকাতা,
২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
২১০/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৩।

মূল্য ॥৵০ দশ আনা।

শ্রীযুত এইচ. জে. এস্. কটন মহোদয়ের

সম্মতিক্রমে

তাঁহারই নামে

এই গ্রন্থ

যথোচিত শ্রদ্ধার সহিত

উৎসর্গ করিলাম।

অনুবাদক।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুত এইচ্ জে. এস্. কটন মহোদয়প্রণীত "নিউ ইণ্ডিয়া" নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ইঙ্গরেজী ভাষাভিজ্ঞ পাঠকবর্গের অবিদিত নাই। ঐ গ্রন্থে বিশেষ উদারতা, সমীচীনতা ও ভারতবাসীদিগের প্রতি প্রগাঢ় সমবেদনার সহিত ভারতবর্ষসংক্রান্ত মত সকল পরিব্যক্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, ভারতে রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির সম্বন্ধে গুরুতর পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনের যুগে গবর্ণমেণ্টের কিরূপ নীতির অনুসরণ করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ের আলোচনা করা গ্রন্থের উদ্দেশ্য। অনেক কারণে বিশেষ ভাষা, রীতি নীতি ও চিন্তার পার্থক্যপ্রযুক্ত শাসক ও শাসিতের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটিয়াছে। ইঙ্গরেজী শিক্ষায় ভারতবাসীদিগের চিন্তার স্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, মানসিক ভাব প্রসারিত হইয়া উঠিয়াছে এবং উচ্চাশা বিকাশ পাইয়াছে। তাঁহারা এই উচ্চাশার পরিতৃপ্তির জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট ক্রমাগত ন্যায়সঙ্গত প্রার্থনা করিতেছেন। কিন্তু এদিকে ভারতপ্রবাসী ইঙ্গরেজসম্প্রদায় গবর্ণমেণ্টকে উহার প্রতিকূলতা করিতে উচ্চৈঃস্বরে অনুরোধ করিয়া আসিতেছেন। এই সঙ্কটকালে ভারতবাসীদিগের ন্যায়সঙ্গত অভিলাষের তৃপ্তিসাধন করা গবর্ণমেণ্টের উচিত। এবিষয়ে ভারতপ্রবাসী ইউরোপীয়দিগের সহায়তা লাভের আশা নাই। আঙ্গ্লো ইণ্ডিয়ান-সম্প্রদায় গবর্ণমেণ্টের এই নীতির প্রতিকূলতা করিতে ত্রুটি করিবেন না।

ভারতবাসীরা কেবল ইঙ্গলণ্ডের সাধারণ মতের বলেই স্বদেশের উন্নতি সাধন করিতে পারেন। ভারতে ধর্ম্ম ও সমাজসংক্রান্ত বিষয়েও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। গ্রন্থকারের মতে এ বিষয়ে গোলযোগ না ঘটাইয়া চিরন্তন শৃঙ্খলার মূল রক্ষা করাই গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। ইঙ্গরেজশাসনে ভারতের যে, অনেক উপকার হইযাছে, গ্রন্থকার তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। ২০ বৎসরের অধিক হইল, তিনি ভারতবর্ষের সিবিল সর্ব্বিসে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার পিতা এবং পিতামহও ভারতের সিবিল কর্ম্মচারী ছিলেন। সুতরাং তিনি বংশপরম্পরায় ভারতবর্ষের শাসনকার্য্যের সহিত লিপ্ত আছেন। গ্রন্থকার প্রকৃত রাজভক্তের ন্যায় ধীরভাবে, অসঙ্কুচিতচিত্তে এবং সমুচিত সাহসসহকারে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে আপনার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে ঐ উৎকৃষ্ট গ্রন্থের অনুবাদ করিতে অনুরোধ করেন। মূল গ্রন্থকার মহামতি কটন সাহেবও এবিষয়ে আগ্রহের সহিত সম্মতি দেন। আমি তদনুসারে উপস্থিত অনুবাদ মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম।

আমি ভাবানুবাদের চেষ্টা পাইয়াছি। অনুবাদে মূল গ্রন্থের প্রকৃত সৌন্দর্য্য রক্ষা করা একান্ত দুরূহ। যাঁহারা মহামতি কটনের লিখিত গ্রন্থ পড়িয়াছেন তাঁহারা অনুবাদ পড়িয়া যে, উহার প্রকৃত সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারিবেন, সে কথা বলিতে আমার কোন সাহস নাই। অনুবাদপাঠে যদি মূল গ্রন্থের আভাস পাওয়া যায়, তাহা হইলেই অনুবাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

অনুবাদসময়ে আমি অনেকের নিকট অনেক বিষয়ে সাহায্য পাইয়াছি। আমার সদাশয় বন্ধু শ্রীযুত বাবু শ্যামলাল সেন প্রথমে উক্ত গ্রন্থের অনেকাংশের অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি ঐ অনুবাদ আমাকে দেন। আমি ঐ অনুবাদ হইতে অনেক বিষয়ে সাহায্য পাইয়াছি। মূল গ্রন্থের সহিত অনুবাদের একতা হইল কি না, তদ্বিষয়ে আমার হিতৈষী ও শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃৎ শ্রীযুত বাবু চন্দ্রমোহন মজুমদার বিস্তর সাহায্য করিয়াছেন। সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত, লেখকশ্রেষ্ঠ, আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন হিতৈষী সুহৃৎ শ্রীযুত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার যত্নসহকারে উপস্থিত গ্রন্থের আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন। অধিকন্তু প্রীতিভাজন শ্রীমান্ হেমেন্দ্রনাথ রায় অনুবাদকালে কোন কোন অংশে আমার সহায়তা করিযাছেন। আমি ইঁহাদের সকলের নিকটেই সরলভাবে যথোচিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

সূচী।

নব ভারত।

(মূলগ্রন্থকার শ্রীযুত কটন সাহেবের উক্তিতে লিখিত।)

রাজনৈতিক সঙ্কট।

অধ্যাপক সীলি তাঁহার "ইঙ্গলণ্ডের বিস্তৃতি" নামক গ্রন্থের এক স্থলে ভারতবর্ষে জাতীয় ভাবের অস্তিত্বসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের পাঠক মহাশয়েরা আগ্রহের সহিত ঐ অংশ পড়িয়া থাকেন। সীলি কহিয়াছেনঃ—

"আমরা ইঙ্গলণ্ডে, ফরাসীদিগের শাসনাধীনে থাকিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক; ফরাসীরাও জর্ম্মানদিগের শাসনে থাকিলে সাতিশয় দুঃখিত হইতে পারে। এই দৃষ্টান্ত ধরিয়া সিদ্ধান্ত করি যে, ভারতবাসিগণও ইঙ্গরেজশাসনে থাকিলে আপনাদিগকে যার-পরনাই অপমানিত বোধ করে। কেবল অনবধানতা ও ঔদাসীন্যপ্রযুক্তই ঐরূপ ধারণার উৎপত্তি হয়। প্রত্যেক দেশের কেবল অধিবাসিগণদ্বারা জাতীয়ভাব সংগঠিত হয় না। ফরাসী ও জর্ম্মানগণ কেবল ফ্রান্স ও জর্ম্মনিদেশের লোকসমষ্টি নহে; ঐ লোকসমষ্টি একটি বিশেষ সূত্রে ও একটি বিশেষ শক্তিতে সম্বন্ধ। ঐ সম্মিলনী শক্তি কি, এবং ভারতবর্ষের লোকসমষ্টিতে ঐ শক্তির কতদূর কার্য্যকারিতা আছে, তাহা দেখা উচিত।"

অধ্যাপক সীলি ইহার পর দেখাইয়াছেন যে, ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের জাতি ও ভাষা এক নহে; সকলের মধ্যে সাধারণ স্বার্থসম্বন্ধ নাই; এক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সকলকে দলবদ্ধ করিবারও প্রথা নাই; একবিধ ধর্ম্ম জাতীয় ভাব সংগঠনের একটি প্রধান উপাদান, কিন্তু ভারতবর্ষে উহারও অভাব লক্ষিত হয়। সুতরাং ভারতে প্রকৃত দেশানুরাগের বিকাশ দেখা যায় না। এই কারণেই আমরা ভারতে অধিকার স্থাপন করিতে পারিয়াছি। যে সকল সৈন্য আমাদের পক্ষে থাকিয়া, ভারতের যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয়শ্রী অধিকার করিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশ ভারতবর্ষীয়। জাতীয় ভাব না থাকাতেই আমরা ঐ সকল ভারতবর্ষীয় সৈন্য আমাদের কার্য্যে নিয়োজিত করিতে সমর্থ হইয়াছি। কিন্তু অধ্যাপক সীলি পরে উল্লেখ করিয়াছেনঃ—

"যদি ভারতে এই ভাবের পরিবর্ত্ত হয়, যদি ভারতের অধিবাসিগণ একটি মহাজাতিতে পরিণত হইয়া উঠে, অস্ট্রিয়ার সহিত ইতালির যে সম্বন্ধ, যদি আমাদের ও ভারতবাসীদিগের মধ্যে সেই সম্বন্ধের কিয়দংশ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, তাহা হইলে সাম্রাজ্যের জন্য আমাদের আশঙ্কা হওয়ার কথা দূরে থাকুক, সাম্রাজ্যরক্ষার আশাতেও আমাদিগকে জলাঞ্জলি দিতে হইবে। কেবল নাম মাত্র বিপ্লব নয়, কিন্তু যে বিপ্লবে সার্ব্বজনীন জাতীয় ভাবের উচ্ছ্বাস লক্ষিত হয়, যে মুহূর্ত্তে সেইরূপ রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিবে, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের সাম্রাজ্যরক্ষার সমস্ত আশাভরসার অবসান হইবে। আমরা প্রকৃতপ্রস্তাবে ভারতবর্ষের বিজেতা নহি। বিজেতা বিজিতকে যে ভাবে শাসন করিয়া থাকে, আমরা

কখনও ভারতবর্ষ সে ভাবে শাসন করিতে পারিব না। যদি আমরা ঐ ভাবে ভারতশাসনে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমাদের এত অর্থ ব্যয় হইবে যে, আমরা সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইব।"

ইহার পর অধ্যাপক সীলি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমরা যে প্রণালীতে ভারতবর্ষ শাসন করিতেছি, তাহাতেই সমগ্র ভারত কালে একটি মহাজাতিতে পরিণত হইয়া উঠিবে। আমাদের পূর্ব্বে আর কেহ ঐ প্রণালীতে ভারতশাসনে প্রবৃত্ত হন নাই। এই মত যথার্থ। ইহাতে অধ্যাপক সীলির গূঢ়-দর্শিতা ও প্রকৃতবিষয়াভিজ্ঞতা পরিস্ফুট হইতেছে। ভারত-বর্ষীয়গণ নানা জাতি, নানা শ্রেণী ও নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ইহাদের কাহারও সহিত কাহারও সমবেদনা নাই। ব্রিটিশ গবর্ণ-মেণ্ট এই সকল জাতি হইতে পৃথক্ থাকিয়া, আত্ম প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ভারতের জনসাধারণের মধ্যে সমবেদনার অভাব থাকিতে পারে, কিন্তু আমাদের গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল জন-সাধারণের প্রতি সমবেদনা দেখাইতে অধিকতর বিমুখ রহিয়াছেন, সমগ্র ভারতের অধিবাসিগণ হইতে অধিকতর দূরে থাকিয়া, শাসনকার্য্য চালাইতেছেন। রাজা ও প্রজার মধ্যে এইরূপ নির্লিপ্তভাব থাকিলে এক সময়ে প্রজাসাধারণ আপনাদের সম্প্র-দায়গত সামান্য সামান্য বিভেদ পরিত্যাগ করিয়া, আমাদের ঐ শাসন-নীতির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে পারে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, সকলে এক ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া আমাদের সম-বেদনা-বিমুখ শাসনপ্রণালীর প্রতিকূল পক্ষ অবলম্বনের নিমিত্ত একতাবন্ধনের প্রয়োজন হয়।

আমরা নিজেই ভারতবর্ষে ঐরূপ একতাবন্ধনের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছি। ইঙ্গরেজী প্রণালীতে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার নিয়মানুসারে যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহারই বলে ভারতের অধিবাসিগণ পরস্পর একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। ভারতে উহা অপেক্ষা, একতার আর কোনরূপ বন্ধনের সম্ভাবনা ছিল না। নানাবিধ ভাষা সকলকে সাম্যসূত্রে আবদ্ধ করিবার পক্ষে একটি প্রধান অন্তরায় স্বরূপ ছিল। কিন্তু এখন ইঙ্গরেজী শিক্ষার প্রসাদে বোম্বাইর অগ্ন্যুপাসকেরা, বঙ্গের বাবুরা, মাদ্রাজের ব্রাহ্মণেরা, পূনার মরহাট্টারা, উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশের রাজপুত ও পাঠানেরা এবং সুদূর দক্ষিণপ্রান্তের তামিল ও তেলিগুভাষীরা একস্থানে সমবেত হইয়া একবিধ স্বার্থ ও একবিধ বাসনাসিদ্ধির জন্য আপনাদের মতামত প্রকাশ করিতেছেন। ইঙ্গরেজী শিক্ষায় বহুকাল হইতে এইরূপ জাতীয়ভাব সংঘটনের বীজ নিহিত ছিল। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ বীজও পরিপুষ্ট হইয়াছে এবং উপস্থিত সময়ে উহা সতেজ বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে। উহার বর্ত্তমান পরিপুষ্টি অন্য কারণে ঘটিয়াছে। একরূপ ফললাভের উদ্দেশে ঐ কারণের সূত্রপাত হইয়াছিল, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে উহা হইতে অন্যবিধ ফলের আবির্ভাব হইয়াছে। লর্ড রিপনের শাসননীতির প্রসঙ্গে ভারতবাসীর বিরুদ্ধে ভারতের ইঙ্গরেজ সম্প্রদায় যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, সেই আন্দোলনে ভারতে জাতীয় ভাব পরিপুষ্ট হয়। ইলবর্ট সাহেব ভারতবর্ষীয় সিবিলিয়ানদিগকে ইঙ্গরেজ সিবিলিয়ানদিগের মত কতিপয় বিশেষ ক্ষমতা দিবার জন্য, যে আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন

সেই পাণ্ডুলিপির জন্যই ঐ তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। "ভারতবর্ষের উপর কেবল ব্রিটিশজাতিরই স্বত্ব রহিয়াছে," আন্দোলনকারিগণ এই বিষয়ের সমর্থন জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইলবর্ট সাহেব যে ভাবে ঐ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, ঠিক সেই ভাবে, উহা আইনে পরিণত হইলে ভারতে যেরূপ একতা হইতে পারিত, মূল পাণ্ডুলিপির বিরুদ্ধে ইঙ্গরেজসম্প্রদায় তীব্র আন্দোলন উপস্থিত করাতে তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণে একতা ঘটিয়াছে। ঐ সামান্য পাণ্ডুলিপিখানি বিনাবাধায় বিধিবদ্ধ হইলে ততটা অনিষ্টকর এবং কোন বিষযে ততটা ফলপ্রদ হইত না, কিন্তু উহার বিরোধিগণ যেরূপ অন্যায়ভাবে চীৎকার আরম্ভ করে এবং আপনাদের চেষ্টায় যেরূপ আশাতিরিক্ত ফলের অধিকারী হয়, তাহাতে ঐ আন্দোলনের প্রতিপক্ষে আর একটি ঘোরতর বহুদূরব্যাপী আন্দোলনের (যাহা কেবল বর্ত্তমান সময়েই শেষ হইবে না, কিন্তু ভবিষ্যতেও থাকিবে) সৃষ্টি হইল। পাণ্ডুলিপির প্রতিপক্ষ ইঙ্গরেজসম্প্রদায়ের তীব্র চীৎকারে তাহাদের বিপক্ষগণও তীব্র চীৎকার উপস্থিত করিল এবং প্রতিপক্ষের বিপক্ষে ইঙ্গরেজী ভাষায় নানা বিষয় লিখিয়া, তৎসমুদয় ভারতের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত বিক্ষিপ্ত করিয়া, তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিল। এই সর্ব্বব্যাপী আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। ভারতের ইঙ্গরেজসম্প্রদায় যদি দূরদর্শী হইতেন, তাহা হইলে ঐ উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ কণ্টকিত করিতে তাঁহারা কোনরূপে কাতর হইতেন না। ভারতবাসিগণ এখন ইঙ্গরেজের প্রবর্ত্তিত দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতেছে। তাহারা

আপনাদের ক্ষমতা, আপনাদের সম্মিলনশক্তি ও আপনাদের সংখ্যাবল জানিতে পারিয়াছে। এখন ভারতের সমস্ত প্রদেশে জাতীয় আন্দোলন হইতেছে। যে পর্য্যন্ত সমগ্র ভারত জাতীয় জীবনে সঞ্জীবিত না হয়, সে পর্য্যন্ত এই আন্দোলন ক্রমে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে।

ভারতের জাতীয়ভাবের পরিপুষ্টির যদি কোন প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক হয়, তাহা হইলে, লর্ড রিপনের ভারত পরিত্যাগ সময়ে ভারতের সকল জাতির, সকল শ্রেণীর ও সকল সম্প্রদায়ের লোক তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনজন্য যেরূপ উৎসাহ ও আগ্রহের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল, তাহাতেই উহার জ্বলন্ত পরিচয় পাওয়া যাইবে। একজন স্বদেশগমনোন্মুখ রাজপ্রতিনিধির প্রতি সম্মানপ্রদর্শন জন্য সমগ্র জাতির এরূপ বিরাট্ সম্মিলন একটি অভিনব দৃশ্য। লর্ড রিপনের প্রতি যেরূপ সম্মান দেখান হইয়াছে, সেরূপ সম্মান একজন বিদেশী শাসনকর্ত্তার প্রতি পূর্ব্বে কখনও প্রদর্শিত হয় নাই। একবিধ কৃতজ্ঞতার আবেশে সমগ্র জাতির এরূপ গভীর উত্তেজনার চিত্র ভারতের ইতিহাসে আর কখনও দেখা যায় নাই। এরূপ একতাসম্পন্ন ও স্বতউদ্ভূত জাতীয় সম্মিলন পূর্ব্বে কখনও দৃষ্ট হয় নাই। জাতীয়ভাব বীজ যে, ক্রমে পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে, তাহা উহা অপেক্ষা আর কোন বিষয় অধিকতর স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিতে পারে না।

বর্ত্তমান সময়ে একজন প্রধান হিন্দু এবং ব্রাহ্ম সমাজের একজন প্রধান পরিচালক কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুতেও ঐরূপ প্রকৃত জাতীয় ভাবের বিকাশ দেখা যায়। ইহার মৃত্যুতে

ভারতের সকল স্থানের সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকই সমভাবে আপনাদের গভীর শোক প্রকাশ করিয়াছিল এবং ইহাকে আপনাদের স্বজাতীয় ও স্বদেশীয় লোক বলিয়া আত্মগৌরব দেখাইয়াছিল। ইহার পরে ভারতের জনগণ একমত হইয়া ইংলণ্ডের প্রতি আপনাদের যে রাজভক্তি (যদিও ইহার প্রতি বিশেষ আস্থা দেখান যায় না) দেখাইয়াছিল, তাহাও এই সর্ব্বব্যাপী জাতীয়-ভাব-সংগঠনের একটি বলবৎ প্রমাণ। এই জাতীয় ভাব কেবল ভারতের একটি প্রদেশে বর্দ্ধিত হয় নাই, ইহা সমগ্র ভারতের সমগ্র শ্রেণীর মধ্যে পরিপুষ্ট হইয়াছে।

এই জাতীয় ভাবের বৃদ্ধিতে বুঝা যাইতেছে যে, ভারতে রাজনৈতিক সঙ্কট ঘটিতেছে। সামাজিক ও নৈতিক সঙ্কটের সহিতও এই সঙ্কটের সম্বন্ধ আছে। শেষ দুই সঙ্কটের বিষয় আমি পরে বলিব। পাশ্চাত্য ধারণা ও পাশ্চাত্য সভ্যতা হইতে এই দুই সঙ্কটের আবির্ভাব হইয়াছে। একদিকে যেমন এ বিষয় ভাল করিবার জন্য ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করিবার কোন ক্ষমতা নাই, অপরদিকে তেমনই ভারতে যে সকল পরিবর্ত্তন আরব্ধ হইয়াছে, সেই সকল পরিবর্ত্তন সুনিয়মিত ও কার্য্যকর করিবার জন্য, ভারতবাসীদিগের সহযোগ হওয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। তবে একটা আশঙ্কার বিষয় এই যে, গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে উদাসীন থাকিলে শিক্ষিত সম্প্রদায় আপনাদের দেশ উপযুক্ত হওয়ার পূর্ব্বে একটা হুলস্থূল কাণ্ড করিয়া বসিবে। জাতীয় পার্থক্য সহজে মিটিয়া যায় না। পরিবর্ত্তনকালের বাহিরে যাহাদের একপদও অগ্রসর হইবার ক্ষমতা নাই, তাহারা প্রায়ই হুজুগে গা ভাসাইয়া দিতে পারে।

সমাজনেতাদের প্রধান শিষ্যেরা আপনাদের উৎসাহ ও একাগ্রতার জন্য যেরূপ অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করে, তাহাতে সমাজনেতারা তাহাদের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে সাহসী হন না। এখন কাল বড় কঠিন পড়িয়াছে। কেবল এ বিষয়ে সতর্কতা ও সাবধানতা প্রকাশ না করিয়া, যথোপযুক্ত উৎসাহ দিলে প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। কোন বিষয় সংগঠিত করিতে হইলে, যাহা সম্ভব, শান্তভাবে তাহাই করা আমাদের উচিত। উহা সম্ভব কি না, তাহা গবর্ণমেণ্টের ন্যায়সঙ্গত সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। অধ্যাপক সীলি যে বিপদের আশঙ্কা করিয়াছেন, ভারতের সে বিপদের সম্ভাবনা নাই। যদি কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব দুর্ঘটনায় আমরা ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই, তাহা হইলে তাহা সাতিশয় ভয়ঙ্কর বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষে আমাদের স্থিতি যে, চিরস্থায়ী নয়, এবং ইঙ্গলণ্ড ও ভারতবর্ষে যে, নানা পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহা অস্বীকার করা আমাদের পক্ষে বাতুলতার লক্ষণ। ভারতবর্ষ যে, তরবারির বলে অধিকৃত হইয়াছে, তাহা প্রকৃত নয়। প্রকৃত হইলে ভারতের অধিবাসিগণ নিয়ত গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ করিত এবং গবর্ণমেণ্টের শক্তিতেই তাহারা অবনত হইয়া পড়িত। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত ঘটনা জানেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, ভারতে ইহার কিছুই ঘটে নাই। ভারতে সর্ব্বদা তরবারির প্রয়োজন হয় নাই, যে হেতু ভারতবাসিগণ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষতা অবলম্বন করে নাই। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয় যে, ভারতে ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীদিগের সহিষ্ণুতায় গঠিত হইয়াছে। ভারত-

বর্ষ তরবারির বলে অধিকৃত হইয়াছে, যাঁহারা এই বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাঁহারাই বলেন যে, ভারতে জাতীয়ভাব সংগঠিত হইলে ইঙ্গরেজশাসন বদ্ধমূল থাকিবে না। ভারতে ইঙ্গরেজশাসন যে, বর্ত্তমান আকারে চলিতে পারে না, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভারতে জাতীয়ভাব-সংগঠনের নেতারা স্বাধীনভাবকে জাতীয়তাসংগঠনের মূল ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করিলেও ইঙ্গ-লণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের যে, সম্বন্ধ ঘুচিবে না, তাহা পূর্ব্ব হইতেই অনুমান করিয়া থাকেন। ইঙ্গরেজী ভাষা যেমন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদিগকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করি-তেছে, সেইরূপ সমগ্র ভারতবাসীদিগকেও ইঙ্গলণ্ডের ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছে। যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় ভারতে এরূপ বিপ্লব ঘটিয়াছে, সেই শিক্ষা ইঙ্গলণ্ড হইতে উদ্ভূত। সেক্ষপীয়র ও মিল্টনের ভাষা এক্ষণে ভারতের সাধারণ ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। ভার-তের ভবিষ্যৎ এক্ষণে ইঙ্গলণ্ডের ভবিষ্যতের সহিত সম্বদ্ধ হইয়াছে। ভারত এক্ষণে আত্মচালনা, আত্মরক্ষা ও আত্মসহায়তা জন্য সর্ব্বদা ইঙ্গলণ্ডের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে। ভারতে এক্ষণে যে জাতীয় ভাবের বিকাশ হইয়াছে, তাহার পরিপুষ্টির জন্য, যে সকল বিষয়ের প্রয়োজন, তৎসমুদয়ের সহিত পরিচিত হওয়া আমাদের অত্যা-বশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের ইতিহাসের হিন্দু ও মুসলমান-দিগের রাজত্বকাল হইতে যেমন ভারতবর্ষ বিচ্যুত হইতে পারে না, সেইরূপ ইঙ্গরেজশাসন হইতেও ভারতবর্ষ বিচ্যুত হইবে না। এমন এক সময় আসিতে পারে, যে সময়ে ভারতের খণ্ডরাজ্য সকল আত্মশাসনগুণে ও স্বাধীনভাবে পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠতা

সূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া ইঙ্গলণ্ডের প্রাধান্য স্বীকার করিবে। ভারতের আবহমানকাল প্রচলিত সামাজিক নিয়ম অনুসারে উচ্চবংশীয়েরা নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের পরিচালন ও শাসনভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভারতে এই সমাজশাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে অভ্যন্তরীণ শান্তিরও আশা করা যাইতে পারে।

ভারতের ভাবী চিত্র এইরূপ। উহা স্পষ্ট ও দূরলক্ষ্য হইলেও উহার ক্রমোন্নতি ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যসাপেক্ষ। পরিবর্ত্তনের যুগে পুনর্গঠন, পরিচালন ও সমবেদনপ্রকাশ করা ভারতগবর্ণমেণ্টের উচিত, উন্নতির সময়ে একাগ্রতা ও কার্য্যকারিতা দেখান কর্ত্তব্য, শান্তিরক্ষা আবশ্যক হইলে, এবং লোকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আপনাদের পবিপুষ্টির চেষ্টা করিলে যখন উৎসাহ দেওয়া আবশ্যক হয়, তখন স্থিরভাবে থাকা এবং মধ্যে মধ্যে চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা অবশ্য বিধেয়। এই সকল বিষয়ে রাজ্যশাসনোচিত ক্ষমতা অপেক্ষা রাজনীতিজ্ঞোচিত গুণই প্রয়োজনীয়। ন্যায় মার্গ অবলম্বন করিয়া শান্তপ্রকৃতি নিরীহ প্রজাদিগকে শাসন কবা সহজ ব্যাপার। ব্রিটিশ সঙ্গিনের ক্ষমতায় বিরক্ত ও বিদ্রোহী রাজাদিগকে বশীভূত করা এবং গুপ্ত মন্ত্রণায় ভারতের মিত্ররাজ্যে পরস্পরবিরোধী বিষয় সকলের মীমাংসা করা সহজ ব্যাপার। সামান্য অস্ত্রধারী অর্দ্ধসভ্য জাতির ভিতর দিয়া আমাদের বিজয়িনী সেনা চালনা করা, পররাজ্য অধিকার করা, এবং গোলযোগের মধ্যে যথেচ্ছাচার শাসনপ্রণালীদ্বারা শান্তি স্থাপন করাও সহজ ব্যাপার। কিন্তু সাম্রাজ্যের শাসনবিষয়ে উহা অপেক্ষা একটি গুরুতর ও গৌরবকর কার্য্য আছে। প্রজাসাধা-

রণের সম্মতিতে যে সাম্রাজ্যের প্রশস্ত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, নানা জাতীয় লোকদিগকে সেই সাম্রাজ্যে আমাদের শাসনাধীনে একত্র করা, তাহাদের জাতীয় জীবন পুনঃসঞ্জীবিত করা, তাহাদের স্বাভাবিক বৃত্তি সকল সম্প্রসারিত ও সংরক্ষিত করা, তাহাদের রাজনৈতিক উচ্চাশা পরিপূরণের সুবিধা করা, এবং তাহাদের যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা দুইটি ভিন্নদেশকে ঘনিষ্ঠতায় আবদ্ধ করিবার মূল ভিত্তিস্বরূপ, শান্তভাবে তাহার পুনর্গঠনে আমাদিগকে ব্যাপৃত করাই, সেই গুরুতর ও গৌরবকর কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত।

ভারতবাসীদিগের ইচ্ছা ও আশা।

ভারতবাসীদিগের অভিলাষের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা এবং আমাদের শাসনসম্বন্ধে ভারতবাসীদের প্রকৃত ভাব হৃদয়ঙ্গম করা ইঙ্গরেজের পক্ষে বড় দুরূহ ব্যাপার। বর্ণ, দেহের গঠন, ধর্ম্ম, ও ভাষাভেদ ভারতবর্ষবাসীদিগের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের অনতিক্রমণীয় অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে। ভারতবাসীদিগকে ইউরোপীয়দিগের নিকট মন খুলিয়া আপনাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে প্রায় দেখা যায় না। অন্য কোন কারণ না থাকিলেও প্রভুভৃত্য সম্বন্ধই একটি প্রধান অন্তরায়। ঐ সম্বন্ধ ব্যতীত ইঙ্গরেজেরা ভারতবাসীদিগের সহিত যে ভাবে ব্যবহার করেন, তাহাতে প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস জন্মিতে পারে না। ভারতবর্ষীয়েরা আপনাদের বাড়ীতে কি ভাবে থাকে, তাহা ইঙ্গরেজেরা কিছুই জানেন না। ভারতবর্ষীয়েরা এই জন্য ইঙ্গরেজসম্প্রদায় হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত করে এবং তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতাস্থাপনে বিমুখ থাকে। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা উচিত যে, ভারতবর্ষীয়েরা তাহাদের বর্ণভেদপ্রযুক্ত ইউরোপীয়দিগের সহবাস হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। ভারতে আমাদের আধিপত্যস্থাপন যত অধিক দিনের হইয়া পড়িতেছে, ততই আমরা ভারতবাসীদিগের আচার, ব্যবহার, অভিমত ও অনুশাসনের বিষয় অল্প জানিতেছি। উভয়ের একত্র থাকা অপেক্ষা পৃথক্‌ভাবে অবস্থিতির ইচ্ছাই যেন ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে।

যে সকল ভারতবর্ষীয়ের সহিত আমাদের আলাপ হয়, তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা ভারতবাসীদিগের মানসিক ভাবের যে আভাস প্রাপ্ত হই, তাহা প্রকৃত নয়। ভারতের অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লোকদিগের সহিত প্রায়ই আমাদেব আলাপ হয় না। দুই একজন ব্যতীত ভারতের সাধাবণমতের পরিচালকগণও আমাদের একান্ত অপরিচিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাহাদের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়, তাঁহাবা হয গবর্ণমেণ্টেব কর্ম্মচারী, না হয়, উচ্চপদস্থ সম্পত্তিশালী ভূম্যধিকাবী। উর্দ্ধতন রাজকর্ম্মচারীদিগের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করাই তাঁহাদেব এক প্রকাব প্রথা হইয়া গিয়াছে। যে সমস্ত রাযবাহাদুব, রাজা ও নবাব গবর্ণর-জেনেবল ও লেফ্‌টেনেণ্টগবর্ণবদিগের খাসকামরায় গিয়া সাক্ষাৎ করিয়া সম্মানিত হন, তাঁহাবা প্রকৃতপক্ষে জনসাধাবণের নেতা নহেন। তাঁহাবা উচ্চপদস্থ উচ্চবংশীয় লোক; এই হেতু তাঁহারা সম্মান ও আদবের পাত্র। কিন্তু তাঁহাদিগকে কখনও জাতির প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। তাঁহাদের কথা জনসাধারণের অভিমত বা মানসিক ভাবেব প্রতিধ্বনি নহে; তাঁহাদের কণ্ঠস্বরে জনসাধাবণেব হৃদযতন্ত্রী ধ্বনিত হয না। যে সকল ভারতবাসী শাসকবর্গেব তোষামোদ করাই প্রধান আমোদ বলিয়া গণনা করেন, তাঁহাবা জনসাধাবণের প্রতিনিধিত্বেব ইঁহাদের অপেক্ষাও অযোগ্যপাত্র। এই সকল লোকের প্রতি তাঁহাদের কর্ম্মপটু, অনলস ও স্বাধীনপ্রকৃতি স্বদেশীয়গণ ঘৃণা-প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইঙ্গবেজী শিক্ষাব সহিত যে উচ্চতব চিন্তাশক্তি অনুস্যূত রহিয়াছে, এই ঘৃণাব ভাব অপেক্ষা তাহাব

অধিকতর সন্তোষকর লক্ষণ আর কিছুই হইতে পারে না। এরূপ অনেক ধনাঢ্য লোক দেখা যায়, যাহারা ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীদিগের সহিত একত্র থাকিতে ইচ্ছা করেন। ইহারা স্বদেশীয় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে সামান্যরূপ আহারাদি দিয়া বিদায় করিতে সঙ্কুচিত হন না, পক্ষান্তরে ইহাদের সুখসেব্য ও মহার্ঘ দ্রব্যাদি এবং উৎকৃষ্টতর আমোদ-প্রমোদের সামগ্রী ইউরোপীয় নিমন্ত্রিতদিগের সন্তোষার্থে প্রস্তুত থাকে। এইরূপ প্রমোদক্ষেত্রে গবর্ণরজেনেরল ও লেফ্‌টেনেণ্টগবর্ণরগণ আবির্ভূত হইয়া থাকেন। আমি এইরূপ স্থলে ইউরোপীয়দিগের আমোদের জন্য, ভারতীয় জীবনের প্রহসন রঙ্গভূমিতে অভিনীত হইতে দেখিয়াছি। এই প্রহসনের চিত্রাবলি নিঃসন্দেহ আমোদজনক, কিন্তু ইঙ্গরেজ দর্শকবৃন্দের মনে উহা বিদ্রূপের ভাব উদ্দীপন করে এবং ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি ঘৃণার ভাব বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এইরূপ অভিনয় দেখাইবার জন্য ভারতের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ যেরূপ হীনতাপ্রকাশ করেন, তাহাতে উচ্চতরভাবসম্পন্ন লোকের যুগপৎ ক্রোধ ও ঘৃণার সঞ্চার হইয়া থাকে। তথাপি রাজপ্রতিনিধি হইতে নিম্নতর ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীদিগের বিশ্বাস যে, এইরূপ প্রমোদভূমিতে উপস্থিত থাকাতে তাঁহারা ভারতবর্ষীয়দিগকে সম্প্রীত করিয়া থাকেন এবং উভয়জাতির মধ্যে দুরতিক্রমণীয় দূরতার অপনোদন করেন। কি ভয়ানক ভ্রম! তাঁহারা এতদ্দ্বারা ভারতবর্ষীয়দিগের তোষামোদ ও দাসত্বেরই পরিপুষ্টি করেন। ঐ নীচ প্রবৃত্তির উৎসাহদানে কখনও প্রয়োজন হয় না। ভারতবাসীদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে ভাল, যাঁহারা আপনাদের মানসিক ক্ষমতায় এবং

উদারতা, সাধুতা ও স্বাধীনতায় সাধারণ মত সংগঠিত ও সমাজ পরিচালিত করিয়া থাকেন, তাঁহারা স্বভাবতঃ আত্মগৌরবে উন্নত হইয়া গোলযোগ হইতে দূরে থাকিতে ভালবাসেন। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের সহিত আলাপ করিতে ব্যস্ত নহেন। গবর্ণমেণ্টের গাঘেসা হইতেও তাঁহাদের প্রবৃত্তি নাই। তাঁহারা রাজপুরুষদিগের আগমনে অভিনন্দনের জন্য এবং রাজপুরুষদিগের বিদায়সময়ে অভিবাদন জন্য রেলওয়ে ষ্টেসনে উপস্থিত হন না। তাঁহারা কোন উচ্চপদস্থ ও ক্ষমতাশালী লোকের সহিত পরিচিত হওয়ার জন্য কোন সভায় উপনীত হন না। তাঁহারা রাজপুরুষদিগের নামে গ্রন্থ সকল উৎসর্গ করেন না, তাঁহাদের সম্মানের জন্য কোনরূপ আয়োজনে নিযুক্ত থাকেন না এবং সাধারণ অট্টালিকা বা রাস্তাঘাট প্রভৃতিতে তাঁহাদের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্যও চেষ্টিত হন না। আপনাদের মৌনব্রতে জ্ঞানগৌরবের পরিচয় দিয়া, আত্মসম্মানে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়া, সাধারণ মতের এই সকল প্রকৃত পরিচালক কর্ত্তব্যপথে বিচরণ করিয়া থাকেন। আপনাদের ক্ষমতাচালনের জন্য যতটুকু হওয়া উচিত, ইউরোপীয়দিগের সহিত ততটুকু মাত্র মিল রাখিয়া, ইহারা আপনাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন। ইঙ্গরেজেরা ইহাদের বিষয় অল্পই জানেন, আর গবর্ণমেণ্ট ইহাদের বিষয় কিছুই জানেন না। কিন্তু জনসাধারণের গৃহে গৃহে ইহাদের নাম গৃহকথাস্বরূপ রহিয়াছে।

ভারতের সাধারণমত রাজধানীতেই সংগঠিত হয়। প্রধান প্রধান নগরে যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি থাকেন, তাঁহারা যে তান ধরেন, সেই তানই সকলে অবলম্বন করে। আপনাদের স্থানীয়

ব্যাপার ব্যতীত, জনসাধারণ; কিরূপে তাহারা শাসিত হইতেছে, সে বিষয়ে নয়, কিন্তু কাহারা তাহাদিগকে শাসন করিতেছে, সে বিষয়ে প্রায়ই উদাসীন থাকে। তাহারা শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আপনাদের পরিচালক বলিয়া চাহিয়া দেখে। পারিস ফ্রান্সের পক্ষে যেরূপ, কলিকাতা বাঙ্গালার পক্ষে তাহা অপেক্ষাও অধিক হইয়া পড়িয়াছে। রাজনীতির অনুশীলনে বোম্বাই ও মাদ্রাজও কলিকাতা অপেক্ষা কম নয়। যাঁহারা ভারতের প্রধান প্রধান নগরে সাধারণ মত আয়ত্ত করিতে পারেন নাই, তাঁহারা যে, ভারতবাসীদিগের মনোগত ভাব বুঝিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা কখনও বলিতে পারেন না। সমগ্র ভারতের সাধারণমতের একতা ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। ভারতবাসীদিগের গভীর চিন্তা এবং ইঙ্গরেজী শিক্ষার বিস্তার এই একতাবৃদ্ধির কারণ। যে সম্প্রদায় রাজনীতি ও রাজ্যশাসনসংক্রান্ত সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা স্বদেশীয় জনসাধারণকে যেরূপ কার্য্য করিতে পরামর্শ দিবেন, যে ভাবে চিন্তা করিতে প্রবর্ত্তিত করিবেন, জনসাধারণ সেইরূপ কার্য্য ও সেই ভাবে চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারে না। শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশের জিহ্বা ও মস্তিষ্কস্বরূপ। বাঙ্গালী বাবুরাই এখন পেশাবর হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত সাধারণ মত পরিচালিত করিতেছেন। উত্তরপশ্চিম-প্রদেশের অধিবাসীরা শিক্ষায় এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতায় যদিও বাঙ্গালীগণের পশ্চাৎ রহিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা তাঁহা-দের বঙ্গের ভ্রাতৃগণের ন্যায় বুদ্ধিমান লোককর্ত্তৃক শাসিত ও পরিচালিত হওয়ার যোগ্য হইয়া উঠিতেছেন। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে

ইহার কোন চিহ্ন দেখা যায় নাই। বাঙ্গালী পঞ্জাবে আপনার ক্ষমতা বিকাশ করিবে, এ ধারণা লর্ড লরেন্স, মণ্টোগোমরি অথবা মাকৃলিয়ডের মনে কখনও উদিত হয় নাই। গতবর্ষে একজন বাঙ্গালী বক্তা উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে ইঙ্গরেজীতে বক্তৃতা করিতে গমন করেন। বিজয়ী যোদ্ধার ন্যায় তিনি সম্মানের সহিত পরিগৃহীত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ঢাকার ন্যায় মূলতানের নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও উৎসাহের সঞ্চার করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে ভারতের জনসাধারণের প্রতিনিধি ছিল না। ইউরোপীয় কর্ম্মচারীরাই তাঁহাদের প্রতি যৎকিঞ্চিৎ কৃপাকটাক্ষপাত করিয়া সাহায্য করিতেন। এইরূপ প্রতিনিধিত্ব অসম্পূর্ণ ছিল। তবে উহা জনসাধারণকে এদেশের সহিত সংস্রবশূন্য ইঙ্গরেজ ব্যবসায়ীদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিত। ইঙ্গরেজী শিক্ষার প্রথম অবস্থায় দেশের এইভাব পরিবর্ত্তিত হয় নাই ; বরং শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তখন পাশ্চাত্যজ্ঞানে অভিজ্ঞ হইয়া জনসাধারণ হইতে পৃথক্ থাকিতেন। তাঁহারা জনসাধারণ অপেক্ষা বহুগুণে শিক্ষিত ছিলেন। জ্ঞানগৌরবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা যে সকল মানসিক ভাবের অধিকারী হইতেন, সে সকল ভাব তাঁহাদিগকে, তাঁহাদের স্বদেশীয়গণ হইতে স্বতন্ত্র রাখিতে বাধ্য করিত। কিন্তু এখন এই অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ভারতের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সংখ্যা এখন যত বৃদ্ধি পাইতেছে, ততই তাঁহারা ইউরোপীয়দিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিতেছেন। বিশেষ, যে সকল রাজকর্ম্মচারী তাঁহাদের উচ্চাশার অন্তরায় স্বরূপ রহিয়াছেন, তাঁহারা

সেই সকল রাজকর্ম্মচারীরও অধিকতর সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াই-তেছেন। তাঁহাদের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, তাঁহারা ততই কম পরিমাণে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকিতেছেন। তাঁহারা যে সম্প্র-দায় হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন, সেই সম্প্রদায়ের সহিত সম্মিলিত হইতে ক্রটি করিতেছেন না। জনসাধারণ এখন শিক্ষিত ব্যক্তি-দিগকে আপনাদের প্রধান প্রতিনিধি জানিয়া আপনাদিগকে তাঁহাদের অধীন করিতে শিখিয়াছে। উপস্থিত সময়ের এই পরিবর্ত্তন হিন্দুসমাজের মঙ্গলের একটি প্রধান লক্ষণ।

সমাজের এই ভাব বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের আন্দোলন বলিয়া, তৎপ্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা যে, এখনকার রীতি হইয়া উঠিয়াছে, আমি তাহার যথাসাধ্য প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করি। যথার্থ বটে, ভারতের সাধারণ মতের পরিচালকগণ অপেক্ষাকৃত তরুণবয়স্ক এবং তাঁহাদের অনুচরগণের অধিকাংশই কলেজের ছাত্র। উপস্থিত বিষয় হইতে যাহা অনুমান করা যায়, তাহা ক্ষুদ্ররূপে দেখাইতে আমার ইচ্ছা নাই। যদি অধিনায়কেরা দূরদর্শী হইতেন, তাহা হইলে যে, এই আন্দোলন অধিকতর কার্য্যকর হইত, তাহা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু ইউ-রোপের সাধারণ মত যে, অনেক পরিমাণে ছাত্রগণকর্ত্তৃক সংগঠিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা আমি নির্দ্দেশ করিতে ভুলিব না। এই-জন্য ভারতের সাধারণ মত যে, ভারতের ছাত্রগণের চেষ্টায় পরিব্যাপ্ত হইতেছে, তাহাতে আমার বিস্ময় জন্মে নাই।

পরিবর্ত্তনের সময়ে তরুণবয়স্কেরাই অধিনায়কের ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। যাঁহাদের যৌবনসুলভ তেজস্বিতা ও উৎসাহ

আছে, তাঁহারা যদি আন্দোলন উপস্থিত করেন, তাহা হইলে সেই আন্দোলন জীবন্ত ও অক্ষুণ্ণভাবে পরিচালিত হয়। যে কোন বিষয়েই হউক, যুবকদিগের ত্রুটি কালে তিরোহিত হইবে। তরুণবয়স্ক আন্দোলনকারী ও হিতৈষিগণ হইতে যে সাধারণ-মতের উৎপত্তি হইয়াছে, কোন অভিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ কোন দেশের, বিশেষ ভারতবর্ষের সেই মতের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে সাহসী হইবেন না। কেন না, যে শিক্ষা হইতে এই আন্দোলনের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই এবং যে আন্দোলন হইতে এই নবযুগ প্রসূত হইয়াছে, তাহাও ভারতবর্ষে আপনার বাল্যলীলা অতিক্রম করে নাই। বর্ত্তমানবংশীয়দিগের বালকেরাই ভবিষ্যবংশীয়দিগের জনক।

উপস্থিত বিষয়ে ভারতপ্রবাসী ইঙ্গরেজেরা যে ভাব প্রকাশ করিতেছেন, তাহা উভয়জাতির মধ্যে বর্ত্তমান সমবেদনাহীন সম্বন্ধেরই পরিচয় দিতেছে। ভারতের ইউরোপীয়দিগের চক্ষের উপর যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহার প্রকৃত ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে তাঁহারা সমর্থ নহেন। যে যন্ত্রে এই পরিবর্ত্তনক্রিয়া হইতেছে, তাহা তাঁহারা জানেন না, এবং যে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহাও তাঁহারা দেখিতে পান না। বণিকসম্প্রদায় আপনাদের কার্য্যেই ব্যস্ত থাকেন। এই কার্য্যসূত্রে যতটুকু আবশ্যক, ভারতের শিক্ষিত লোকের সহিত তাহার অধিক মেশামিশি করিতে তাঁহাদের অবকাশ বা অভিপ্রায় নাই। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা শীঘ্রই ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া উঠেন। প্রাচ্য ভূখণ্ডে আমাদের অবস্থাভেদে এই বিদ্বেষভাব

একরূপ অপরিহার্য্য বলিয়া বোধ হয়। ঐ সম্প্রদায় ভারতীয় ঘটনা বা ভারতীয় লোকের প্রকৃতিসম্বন্ধে কিছুই অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন নাই। দুই একজন ব্যতীত সৈনিক বিভাগের কর্ম্মচারিগণও ভারতের জনসাধারণের অবস্থাবিষয়ে অনভিজ্ঞ। তাঁহাদের অব্যবহিত অধীনে যে সকল সৈনিক পুরুষেরা কার্য্য করে, তাঁহারা কেবল তাহাদের অবস্থাই জানেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের সম্বন্ধে সিবিলিয়ানদিগের নিঃসন্দেহ বেশি জ্ঞান আছে। কিন্তু তাঁহাদের এই অভিজ্ঞতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে এবং প্রদেশীয় নগরসমূহেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহার অতি অল্প মাত্রই তাঁহাদের দৃষ্টিতে পড়ে। তাঁহারা আপনাদের উচ্চ পদের আপাতরমণীয় ভাবে এবং তাঁহাদের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী ভারতবর্ষীয়দিগের স্তুতি-গীতিতে অনেক সময়ে প্রভাবিত হইয়া থাকেন। ক্ষমতাপন্ন লোকদিগের সহিত সদ্ভাব রাখাই এই সকল ভারতবর্ষীয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। সিবিলকর্ম্মচারীরা আপনাদের সংসর্গ, স্বার্থ এবং পূর্ব্বভাবপ্রযুক্ত কোনরূপ পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা স্বীকার করেন না। যদিও ইহারা কখনও কোন গুরুতর সামাজিক পরিবর্ত্তন স্বীকার করিতে বাধ্য হন, তাহা হইলেও নানা কথায় উহা উড়াইয়া দেন। সর্ব্বশেষে ইহাও বলা উচিত যে, গবর্ণমেণ্ট উপস্থিত বিষয়ের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন না। সুদূরবর্ত্তী হিমালয়ের প্রশান্ত শিখরে অবস্থিত থাকাতে গবর্ণ-মেণ্ট রাজধানীর অভ্যন্তরীণ বিবরণ জানিতে পারেন না। এত-দ্ব্যতীত ঐ বিষয় জানার সম্বন্ধে আরও গুরুতর অসুবিধা আছে।

গবর্ণমেণ্টের প্রধান প্রধান মন্ত্রীরা রাজধানী ব্যতীত অন্য স্থান হইতে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিয়া থাকেন। তাঁহারা যে প্রদেশের শাসনকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন তাহার রাজধানীতে কি হইতেছে, তাহা তাঁহারা কিছুই জানেন না। ভারতের চিন্তাশীল সমাজ-নেতাদের সংসর্গে থাকিয়া তাঁহারা স্থানীয় বিবরণে অভিজ্ঞতা লাভ করেন না।

যিনি অসঙ্কুচিতচিত্তে ভারতের অধিবাসীদিগকে ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্টের অনুরক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তিনি অসমসাহসী পুরুষ। যদি বাহ্যচিহ্ন ধরিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে গত রুশ-সঙ্কটে যে সকল অধিপতি রুশের আক্রমণে বাধা দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে আপনাদের সৈন্য সমর্পণ করিয়াছিলেন, শান্তিময় সাম্রাজ্যের যে সকল সমৃদ্ধ ব্যক্তি ঐ উদ্দেশ্যে আপনাদের ধনসম্পত্তি গবর্ণমেণ্টেকে দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, যে সকল ভারতীয় সংবাদপত্র একবাক্যে আপনাদের রাজভক্তির যথোচিত পরিচয় দিয়াছিলেন এবং সাধুচিন্তার যে সকল পরিচালক আপনাদের দেশরক্ষার জন্য ইঙ্গরেজদের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতে ইচ্ছা করিয়া, সখের সৈনিকপুরুষের পদে ব্রতী হইতে আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন, তাঁহাদের রাজভক্তির সম্বন্ধে কখনও সন্দেহ জন্মিতে পারে না। এই সকল বাহ্যচিহ্নে পাঠকগণ অযথা চালিত না হন, সেজন্য আমি তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকে যখন ঐরূপ সাহায্যদানে অগ্রসর হন, তখন তাঁহাদের উদ্দেশ্যও ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির হইয়া থাকে। ভারতের যে সকল অধিপতি আপনাদের সৈন্যদিগকে

গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ঐরূপ করিয়া বিজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছেন। প্রথমত তাঁহারা জানিতেন যে, তাঁহাদের ঐ দান সম্ভবতঃ গৃহীত হইবে না। তাঁহারা ইহাও জানেন যে, লর্ড ডালহৌসীর পররাজ্যগ্রহণবিষয়িণী-নীতি পার্লিয়ামেণ্ট ও ইঙ্গরেজজাতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেও এখনও ভারতের রাজপুরুষদিগের অনুমোদিত রহিয়াছে। তাঁহাদের সৈন্যদল উঠাইয়া দিবার জন্য নিরন্তর প্রস্তাব চলিতেছে। আপনাদের রাজ্যে সৈন্যরাখা তাঁহাদের সম্মানের চিহ্ন। এই চিহ্ন না থাকিলে তাঁহাদের স্বাধীনতার গৌরব থাকে না। তাঁহারা এখন আপনাদিগকে রক্ষা করিতে অসমর্থ। এমন কোন বিচারপতি নাই, যাঁহার নিকট তাঁহারা ন্যায্য বিচার প্রার্থনা করিতে পারেন। এমন কোন সাধারণমত নাই, যাহা তাঁহাদের স্বার্থরক্ষায় অভিব্যক্ত হইতে পারে। তাঁহাদের সহিত গবর্ণমেণ্ট যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা সাধারণের জানিবার সুবিধা নাই। তাঁহাদের পদগৌরব ও মর্য্যাদা, তাঁহাদের রাজধানীস্থিত ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের অভিরুচির উপর এবং সিমলাস্থিত পররাষ্ট্র-বিভাগের যথেচ্ছাচারময় গোপনীয় আদেশলিপির উপর নির্ভর করিয়া থাকে। রুশ ভারত আক্রমণ করিলে ভারতের অধিপতি-বর্গের সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করা নিশ্চয়ই গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া উঠিত। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের হস্তে আপনাদের সৈন্যদিগকে সমর্পণ করা, অথবা তাহাদের নিরস্ত্রীকরণে সম্মতি প্রকাশ করা ব্যতীত, উক্ত নৃপতিবর্গের আর কোন গতি ছিল না। উপস্থিত স্থলে তাঁহারা প্রথম উপায় মনোনীত

কবিয়া বিজ্ঞতাব পবিচয দিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে আপনাদেব সৈন্যদিগেব নিবস্ত্রীকবণরূপ যে অবমাননাকব প্রস্তাব দাম-ক্লিসেব তববাবিব * ন্যায তাঁহাদেব মাথাব উপব ঝুলিতেছে, সেই অবমাননা দূব কবিবাব জন্য তাঁহাবা বিজ্ঞোচিত উপাযই অবলম্বন কবিযাছিলেন। তাঁহাবা বাজভক্ত বলিযা প্রতিপত্তি লাভ কবিযাছেন। ভাবতেব অপবাপব অধিবাসিগণ অপেক্ষা যে, ভাবতেব অধিপতিগণ ইঙ্গবেজ গবর্ণমেণ্টেব কম অনু-বক্ত, এবং রুশেব জযলাভ যে, জনসাধাবণ অপেক্ষা তাঁহাদেব পক্ষে কম বিবাগজনক, আমি একথা বলিতেছি না। আমি কেবল ইহাই বলিতেছি যে, যে ইচ্ছা তাঁহাদিগকে ঐ রূপ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত কবিযাছিল, তাহা বাজনৈতিক সুবিধাব জ্ঞান হইতে উদ্ভূত হইযাছে। তাঁহাবা এই ইচ্ছাবলে বাজনৈতিক বিষয়ে লাভবান্ হইযাছেন। গবর্ণমেণ্টেব হস্তে আপনাদেব সৈন্যসম-র্পণেব প্রস্তাব কবাতে তাঁহাদেব কিছুই ক্ষতি হয নাই, ববং বিস্তব লাভ হইযাছে।

আমাদেব বাজ্যশাসনেব প্রতি শ্রদ্ধাপ্রযুক্ত ভাবতেব বাজগণ ঐ প্রকাব সাহায্যদানে উদ্যত হন না, ইহা স্বীকাব কবা

* দামক্লিস্ সাইবাকুসেব যথেচ্ছাচাবী ভূপতি দিওনিসিয়াসের বিদূষক। প্রথিত আছে, দামক্লিস্ বলিতেন যে, বাজা হইলেই সুখসৌভাগ্যের অধিকাবী হওয়া যায। দিওনিসিযাস্ দামক্লিস্‌কে যথোচিত শিক্ষা দিবার জন্য একটি সমৃদ্ধ ভোজে নিমন্ত্রণ কবেন। তিনি ভোজনে বসিযাছেন, তাঁহাব মাথাব উপর এক গাছি সূক্ষ্ম কেশে একখানি তববাবি ঝুলিতেছে। দামক্লিস্ ইহাতে সন্ত্রস্ত হইযা উঠিলেন। তাঁহাব ভোজন বিডম্বনাস্বরূপ বোধ হইল। তিনি বুঝিলেন যে, বাজা হইলেও এইরূপ সঙ্কটে পড়িতে হয।—অনুবাদক।

আমাদের জাতীয় অহঙ্কারের বড় গৌরবজনক নয়। কিন্তু সত্য-কথা বলাই ভাল, এবং সত্যকথা না বলিলে আমরা যে রাজ-নৈতিক বিষম ভ্রমে পতিত হইতাম, সত্যকথা বলিয়া তাহা হইতে সহজে নিষ্কৃতি লাভ করাই ভাল। ইঙ্গরেজীভাষাভিজ্ঞ শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যে, অসন্তোষ ও বিরাগের অন্তঃস্রোত তীব্র-ভাবে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা আমাদের অনুভব করা উচিত। সংবাদপত্রে রাজভক্তির যে উচ্ছ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে বিশেষ আস্থা রাখা বিধেয় নহে। এই শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এখন-কার সময়ে বিবেচক বলিয়া পরিচিত। তাঁহারা যে চিহ্ন দেখাই তেছেন, তাহার যাথার্থ্যবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান শৃঙ্খলার মূলভিত্তি দৃঢ়রূপে রক্ষা করিবার জন্য, অসাম যিক পরিবর্ত্তন নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত, এবং যে পর্য্যন্ত অধিকতর স্থবিধার সহিত কোন পরিবর্ত্তন না ঘটে, সে পর্য্যন্ত বর্ত্তমান অবস্থা রক্ষা করিবার জন্য, শিক্ষিত সম্প্রদায় আপনাদের ঐ সকল উদ্যম দেখাইয়া থাকেন। রুশের আক্রমণভীতি এখন সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ভারতবাসীরা ইঙ্গরেজের রাজত্ব ভাল বাসে না বটে, কিন্তু রাজপরিবর্ত্তন দেখি-তেও তাহারা ইচ্ছা করে না। শিক্ষিত সম্প্রদায় হঠাৎ কোন পরিবর্ত্তন ইচ্ছা করেন না, যেহেতু তাঁহাদের আশঙ্কা আছে যে, পরিবর্ত্তনে ইহা অপেক্ষাও অধিকতর অনিষ্টাপাতের সম্ভা-বনা রহিয়াছে। তাঁহারা জানেন যে, ইঙ্গরেজ রাজত্বের অবসান হইলে ঘোরতর দুর্ঘটনা উপস্থিত হইবে। তাঁহারা জানেন যে, যদি আমরা অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলার বন্দোবস্ত না করিয়া

ইচ্ছাপূর্ব্বক ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া যাই, তাহা হইলে তাঁহারা অবিলম্বে দুর্দ্ধর্ষ ও নিরক্ষর যোদ্ধাদিগের অধীন হইয়া পড়িবেন। তাঁহারা ইহাও বিশেষ রূপে জানেন যে, রুশ যদি ইঙ্গরেজদিগকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে রুশরাজত্ব ইঙ্গরেজ-রাজত্ব অপেক্ষা অধিকতর নিস্বার্থপর বা অধিকতর মঙ্গলকর হইবে না। অন্ততঃ তাঁহারা ইহাও জানেন যে, রুশ যদি ভারতে উপনীত হয়, তাহা হইলে তাঁহারা আয়াস স্বীকার করিয়া ইঙ্গরেজী শিক্ষার গুণে যে সকল বিষয় লাভ করিয়াছেন, তৎসমুদয় একবারে নষ্ট হইবে। রুশের শাসনপ্রণালী ও রুশের রাজনীতির সম্বন্ধে তাঁহারা একান্ত অনভিজ্ঞ। ভারতপ্রবাসী ইঙ্গরেজের অপেক্ষা তাঁহাদের রুশভীতি ও রুশের প্রতি বিরাগ অধিক। ঐ সকল ইঙ্গরেজ রুশের কথা বলিতে গিয়া, যেরূপ ভাষা প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাঁহারাও সেই ভাষার অনুসরণে সঙ্কুচিত হন না। ইঙ্গরেজী শিক্ষায় তাঁহাদের মধ্যে যে ইঙ্গরেজী সংস্কার প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহার জন্যই রুশের প্রতি এইরূপ বিরাগ জন্মিয়া থাকে। এজন্য আমার বোধ হয় যে, তাঁহারা রুশের বিপক্ষে যে সকল মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবং ইঙ্গলণ্ডের বিপদের সময়ে ইঙ্গলণ্ডকে সাহায্য করিতে ও ইঙ্গলণ্ডের জন্য সমরস্থলে অবতীর্ণ হইতে তাঁহারা যে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহা নিঃসন্দেহ অকৃত্রিম। কিন্তু উহা কিয়ৎপরিমাণে অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয়। ভারতের কোন কোন সংবাদ-পত্রের সুচতুর সম্পাদক কোন কোন বিশেষ ঘটনায় (অভিনব গবর্ণরজেনেরলের নিয়োগসময়ে প্রায়ই এরূপ ঘটে) আপনাদের রাজভক্তির পরিচয় দিবার বিশেষ সুবিধা মনে করিয়া, যত-

দুর পারেবন, আপনাদের পত্রে ‘রাজভক্তির ছড়াছড়ি করিয়া থাকেন। এই সুযোগে তাঁহারা আপনাদের বিশ্বস্ততা এবং শাসনকার্য্যে আপনাদের অধিকতর অধিকার পাওয়ার দাবীর সমর্থন করেন। যদি রাজভক্তি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে এই দাবী অস্বীকার করা অসম্ভব। গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীদিগকে বেশী কিছু না দিলেও অন্ততঃ তাহাদিগকে রাজভক্ত প্রজা বলিয়া তাহাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথঞ্চিৎ পরিপূরণ করা গবর্ণমেণ্টের উচিত। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রদর্শিত ঐ সকল বিষয়, আমাদের গবর্ণমেণ্টের স্বপক্ষতার জন্য ভারতবাসীদিগের একাগ্রতার চিহ্ন নহে, কিন্তু উহা, এই গবর্ণমেণ্ট ইহা অপেক্ষা অন্য কোন অনিষ্টজনক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পর্য্যুদস্ত না হয়, তাহারই জন্য ব্যাকুলতার চিহ্ন স্বরূপ। উহা রাজার প্রতি ভক্তি বা রাজার প্রতি অশ্রদ্ধার চিহ্ন নহে। ভারতের ন্যায় একটি অধীন দেশের অধিবাসীদিগের সম্বন্ধে রাজভক্তি বা রাজার প্রতি অভক্তির কথা যে, প্রয়োজিত হয়, তাহার কোন অর্থ নাই। ইঙ্গলণ্ডের শাসনে তাহাদের অনেক সুবিধা আছে, বুঝিতে পারে বলিয়া, ভারতের অধিবাসিগণ রাজভক্ত, এবং ইঙ্গরেজশাসনে তাহাদের অনেক উপকার হইয়াছে বলিয়া, তাহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি কৃতজ্ঞ *। ইহাই যদি রাজভক্তি হয়, তাহা হইলে তাহারা

* ইণ্ডিয়ান নেসন (ভারতীয় জাতি) নামক একখানি সংবাদপত্র দক্ষতার সহিত পরিচালিত হয়। উহার নামও উপযুক্তরূপে স্থির হইয়াছে। এই সংবাদপত্রে একজন ভারতবর্ষীয় লেখক ঐ ভাব বিশদরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, “আমরা এই দেশে সভ্যতার অনুমোদিত সুবিচারপ্রণালী, বিশেষ ফৌজদারী মোকদ্দমায়, ন্যায়পরতা, ধর্ম্মবিষয়ে নিরপেক্ষতা, মুদ্রণ-স্বাধীনতা, সভাস্থাপন ও আবেদন করিবার স্বাধীনতা—

রাজভক্ত। তাহারা ইঙ্গরেজ-স্বাতন্ত্র্যের উচ্ছেদ কামনা করে না। কিন্তু আপনাদের ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত হওয়াতে, যে সকল দেওয়া হইবে বলিয়া তাহাদিগকে গম্ভীরভাবে পুনঃপুনঃ আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে, তৎসমুদয়ে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করাতে, ইউরোপীয়গণ তাহাদের প্রতি ঘৃণিত ব্যবহার করাতে এবং তাহাদের বিধিসঙ্গত উচ্চাশাসকল পুনঃপুনঃ পাদদলিত হওয়াতে, তাহারা মর্ম্মাহত—ঘোরতর মর্ম্মাহত। গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সাধ্যানুসারে সদুপায়ে আপনাদের অভীষ্ট বিষয় ছিনিয়া লওয়ার চেষ্টা করা যদি রাজভক্তিশূন্যতার লক্ষণ হয়, তাহা হইলে তাহারা রাজভক্তিশূন্য। রাজকার্য্যে প্রবেশের দ্বার হইতে দূরে অপসারিত থাকিয়া তাহারা উদ্ধতন ইঙ্গরেজ রাজপুরুষদিগের অন্যায় কার্য্যের তীব্র সমালোচন করে, ইহা যদি রাজভক্তিশূন্যতার লক্ষণ হয়, তাহা হইলে তাহারা রাজভক্তি-শূন্য। শাসকসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বনের জন্য সাধারণ মত সংগঠিত করা এবং আপনাদের অধিকার রক্ষার জন্য লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরগণের রাজনীতি ও গবর্ণমেণ্টের ফৌজদারী দেওয়ানী কর্ম্মচারিগণের কার্য্যের সমালোচনা করা, যদি রাজভক্তিশূন্যতার লক্ষণ হয়, তাহা হইলে তাহারা রাজভক্তিশূন্য। কিন্তু ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্টকে ভারতবর্ষ হইতে নিষ্কাশিত হইতে দেখার ইচ্ছা যদি রাজভক্তিশূন্যতা হয়, তাহা হইলে তাহারা রাজভক্তিশূন্য নয়। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এরূপ মনোগত ভাব নয়, এবং

এই সকল অধিকার এত সহজে পাইয়াছি যে, তৎসমুদয়ে অনাদর করিলে আমাদের বিপদ ঘটিবে। ইঙ্গরেজ তাহাদের দেশে নিজের রক্ত দিয়া যে সকল সুবিধা পাইয়াছে; আমরা হিতৈষী ব্যবস্থাদাতাদিগের লেখনীর কয়েক আঘাতেই তাহা পাইয়াছি।”

ইহা সমগ্রজাতিরও মনোভাব নয়। যে গবর্ণমেণ্ট হইতে অতীত সময়ে তাহারা অসংখ্য উপকার পাইয়াছে, তাহার প্রয়োজনীয়তা অখণ্ডনীয় বলিয়াই তাহারা সহিষ্ণু হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু যে ভিত্তিতে গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার বাহিরে গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃকই যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, যে পর্য্যন্ত সেই সকল পরিবর্ত্তন গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত না হয়, সে পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তন করিতে তাহারা স্থিরসঙ্কল্প রহিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তাহাদের উপর সর্ব্বাংশে বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাহাদিগকে দেওয়ানী ও সৈনিক বিভাগে সর্ব্বোচ্চ পদ দিতে কুণ্ঠিত না হন, ইহাই তাহাদের প্রার্থনা। তাহারা ইহাই চাহে যে, গবর্ণমেণ্ট কেবল নামমাত্র নয়, কিন্তু প্রকৃত সাম্য প্রদর্শন করুন, তাহাদের দেশশাসনে তাহাদের অভিমত গ্রহণ করুন এবং তাহাদিগকে উচ্চতর রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতে থাকুন।

লর্ড রিপন বলিয়াছেন * 'ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্ট যতদূর ভাল শিক্ষা দিতে পারেন, ততদূর ভাল শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া বহুসংখ্যক লোককে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমাদের স্কুল হইতে প্রতি বর্ষে প্রতি মাসে বাহির করিয়া দিতেছেন। আমরা তাহাদের সম্মুখে নব নব চিন্তা ও নব নব ধারণা স্থাপন করিয়াছি, এবং তাহাদের হৃদয়ে নানা উচ্চাভিলাষের উদ্রেক করিয়া দিয়াছি। এখন এই সকল লোককে কি, ইহা বলা সম্ভব যে, আমরা তোমাদিগকে যে উচ্চাশায় অনুপ্রাণিত করিয়াছি, সে উচ্চাশা সফল করিবার জন্য কোন পথ করিয়া দিব না, যে অভি-

* বর্ত্তমান বর্ষের (১৮৮৫) প্রারম্ভে লীডস্ নগরের উদারনৈতিক সমিতি লর্ড রিপনকে যে ভোজ দেন, তাহাতে লর্ড রিপন এই বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

লাষ তোমাদের হৃদয়ে উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়াছি, সে অভিলাষ তৃপ্তির কোন উপায়, আমাদের হইতে হইবে না।” লর্ড রিপন বেশ বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিতে পারিতেন যে, ঐ সকল শিক্ষিত লোককে ঐরূপ উত্তর দেওয়া তাঁহার নিকট রাজনৈতিক ভ্রমের পরাকাষ্ঠা বলিয়া বোধ হয়। পার্লিয়ামেণ্টের কমন্স সভায় লর্ড মেকলে যাহা বলিয়াছিলেন, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতেছিঃ—“আমরা কি এই সকল লোককে আমাদের বশীভূত রাখিতে ইচ্ছা করি? অথবা আমরা কি তাহাদের উচ্চাভিলাষ উদ্দীপ্ত না করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে পারি? বা ঐ উচ্চাভিলাষের তৃপ্তির কোন সুবিধা না করিয়া উহা কেবল উদ্দীপ্ত করিয়া দিতে পারি? কে এই সকল বিষয়ের “হাঁ” বলিয়া উত্তর দিতে পারে? যে সকল ব্যক্তি ভারতবাসীদিগকে চিরদিনের জন্য উচ্চ পদ হইতে বঞ্চিত রাখা উচিত বোধ করেন, তাঁহাদিগকে ঐ সকল প্রশ্নের কোন একটির উত্তরে “হাঁ” বলিতেই হইবে। আমার নিজের কোন আশঙ্কা নাই। কর্ত্তব্যের পথ আমাদের সম্মুখে পরিষ্কাররূপে বিস্তৃত রহিয়াছে। ঐ পথই জ্ঞানের, জাতীয় সমৃদ্ধির এবং জাতীয় সম্মানের পথ।” ইঙ্গলণ্ডের ন্যায় একটি উচ্চতর রাজশক্তি ভারতবাসীদিগকে এখনকার দিনে ক্রমাগত অবনত রাখিয়া শাসন করিবেন এবং তাহাদের উন্নতি ও স্বাধীনতার পথ অবরুদ্ধ করিয়া দিবেন, ইহা অপেক্ষা অযোগ্য ও ঘৃণিত রাজনীতি আর সম্ভবে না। লর্ড এলেন্‌বরা ১৮৫৩ অব্দে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় সাক্ষ্য দিবার সময়ে এই রাজনীতিই ঘোষণা করিয়াছিলেন। ১৮৮৩ অব্দে ইলবর্ট বিলের বিরুদ্ধে এই রাজনীতিই ভারতপ্রবাসী সমগ্র ইঙ্গ-

রেজ সম্প্রদায়ের মুখে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। যাহাতে ঐ বিলের সম্বন্ধে রাজপুরুষদিগের মত সকল সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা নিরুৎসাহজনক গ্রন্থ শাসনসংক্রান্ত সাহিত্যের মধ্যে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইঙ্গরেজ সম্প্রদায় সময়ের চিহ্ন বুঝিতে অনিচ্ছুক এবং বর্ত্তমান অবস্থা যে, আর থাকিতে পারে না, তাহা ধারণা করিতে অসমর্থ। ইহা অপেক্ষা শোচনীয় বিষয় আর কিছুই নাই। সুতরাং বর্ত্তমান দৃশ্য বড় আশাপ্রদ নহে। ভারতপ্রবাসী-ইঙ্গরেজ সম্প্রদায় লর্ড রিপনের প্রতি গুরুতর বিরক্তি করিয়াছিলেন। যেহেতু তাঁহারা দীর্ঘকাল ভারতে থাকিয়া যাহা বুঝিতে পারেন নাই, লর্ড রিপণ তাহা বুঝিয়াছিলেন, বুঝিয়াছিলেন যে, শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার বলে ভারতে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, গবর্ণমেণ্টের রাজনীতিও এখন সেই পরিবর্ত্তনের উপযোগী করিয়া তুলা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের ইঙ্গরেজ সম্প্রদায় এই অভিনব রাজনৈতিক শক্তির বিষয় বুঝিতে অসমর্থ। এই অসামর্থ্যপ্রযুক্ত ভারতের প্রজাপুঞ্জের উপর তাহাদের বিরাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং তাঁহাদের নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্যের আশা করা যাইতে পারে না। গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ অনেক ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীও উপস্থিত বিষয়ে বেসরকারী ইঙ্গরেজ সম্প্রদায়ের সহিত একমত হইয়াছেন। ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি সার্ব্বজনীন উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতি সমবেদনা ও উৎসাহ দেখাইয়া যে রাজনীতির পরিচয় দিয়াছিলেন, ঐ সকল রাজপুরুষও বেসরকারী ইঙ্গরেজ সম্প্রদায়ের ন্যায় সেই রাজনীতির বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বনে ক্রটি করেন নাই।

জাতিগত বিদ্বেষের আতিশয্য।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে ইঙ্গরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে সম্বন্ধবিষয়ে আমার মনে স্বতই কতকগুলি চিন্তার উদয় হয়। বিষয়টি, বড় শোচনীয়। কিন্তু আমি এস্থলে উহার উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না। ইঙ্গরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে যে, কোন সময়ে সদ্ভাব ছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না। কোন সময়ে উভয় জাতির মধ্যে প্রকৃত সমবেদনা, মেশামিশির চিহ্ন বা দুইটি জাতির সংমিশ্রণে একটি জাতি হওয়া ঘটে নাই। উভয়ের মধ্যে বিরাগের ভাব চিরকাল চলিয়া আসিতেছে।

*　　*　　*　　*　　*

অধিক কি, লর্ড মেকলের ন্যায় একজন উদারপ্রকৃতি বড় লোকও ভারতবাসীদিগের প্রতি বিদ্বেষভাব হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন নাই। তিনি বাঙ্গালীচরিত্রের যে অপকৃষ্ট অপবাদজনক বর্ণনা করিয়াছেন, যে বর্ণনা সহস্র সহস্র লোকের, ভারতবাসীর প্রতি বিদ্বেষভাব উত্তেজিত করিয়া দিয়াছে, তাহাতে সেই সময়ের ইঙ্গরেজদিগের মনের ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। যখন এরূপ মনোগত ভাব প্রকাশ্যরূপে ব্যক্ত হইত, তখন উভয়ের মধ্যে কখনও সদ্ভাব ছিল না। কিন্তু সাধারণতঃ বলিতে গেলে ইহাই বলা যায় যে, বর্ত্তমান সময়ে শাসক ও শাসিতের মধ্যে অসদ্ভাবের যেরূপ তীব্রতা দেখা যায়, প্রাচীন সময়ে সেরূপ

ছিল না। তখনকার ইঙ্গরেজদিগের মনে আত্মপ্রাধান্য এবং ভারতবাসীদিগের প্রতি ঘৃণাজনক তাচ্ছল্যের ভাব প্রকাশ পাইত।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ভারতবাসী অপেক্ষা ইউরোপীয়গণই অধিকতর বিদ্বেষ (এই বিদ্বেষভাব এখন উভয় জাতির মধ্যে বৃদ্ধি পাইতেছে) দেখাইয়া আসিতেছেন। যাঁহারা ভারতবাসীদিগের প্রকৃতি জানেন, তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতবাসিগণ স্বভাবতঃই স্নিগ্ধস্বভাব ও কৃতজ্ঞ। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' নামক সংবাদপত্রে প্রকাশিত "ন্যায়পর, উদারচেতা ইঙ্গরেজের প্রতি ভারতবাসীদিগের অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতা" শীর্ষকযুক্ত একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধে এবিষয়ে অনেক কথা আছে। উহার কিয়দংশ এই স্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"ভারতবর্ষীয়েরা বিজেতা জাতিকে আন্তরিক ঘৃণা করে বলিয়া তাহাদের উপর যে অপবাদ দেওয়া হয়, ইঙ্গরেজবিশেষের প্রতি ভারতবাসীদিগের অনুরাগই তাহার প্রতিবাদ করিতেছে। এই অনুরাগ ভারতবাসীদিগের প্রকৃতিসিদ্ধ লক্ষণ। ভারতবর্ষে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে কোন না কোন ইঙ্গরেজ, সেই স্থানের অধিবাসীদিগের উপকার বা অনুপকার হউক, কোনরূপ কাজ করিয়া যান নাই। ভারতবাসীরা যেমন অপকারী ইঙ্গরেজের নাম বিস্মৃত হইতেছে, তেমনই ন্যায়পর বা বদান্য ইঙ্গরেজের নাম, প্রবাদবাক্যের ন্যায় জীবন্তভাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ইহা ভারতবাসীদিগের অল্প গৌরব বা অল্প শ্লাঘার বিষয় নয়। ভারতবাসীদিগের সরলতা, ক্ষমাশীলতা ও কৃতজ্ঞতার

ইহা একটি চিরস্থায়ী প্রমাণ। তীব্র বিদ্বেষভাব প্রকাশ করা ভারতবাসীদিগের প্রকৃতি নহে। ভারতবাসীর হৃদয় স্বভাবতই স্নেহপ্রবণ। বিজেতাদিগের কাহারও প্রতি যখনই স্নেহরস প্রবাহিত হয়, তখনই উহা অধিকতর উচ্ছ্বাসপূর্ণ ও অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে। আমরা কোন উপকারের প্রত্যাশায় ঐরূপ করি না। কিন্তু যে অধঃপতিত ও বিজিত জনসাধারণ, যে জাতির নিকট হইতে এরূপ উপকার পাইয়াছে, প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহাদের অনুগ্রহভাজন হওয়ার আশাতেই তাহারা এরূপ করিয়া থাকে। যাঁহারা আমাদের উপকার করিতে ইচ্ছা করেন, অথবা যাঁহারা আমাদের অনেক উপকার করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের এমনই শ্রদ্ধা ও প্রীতি যে, যদি ঐ সকল উপকারের সহিত অপকার মিশ্রিত না থাকিত, তাহা হইলে ইঙ্গরেজেরা আমাদের নিকট দেবভাবে পূজিত হইতেন।”

আমার বোধ হয়, উপরের উদ্ধৃত অংশে কোন অত্যুক্তি নাই। যে সকল ইঙ্গরেজ রাজপুরুষ ভারতবর্ষ হইতে বেতন লইয়া আপনাদের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যকর্ম্ম ব্যতীত ভারতবাসীদিগের জন্য আর কিছুই করেন নাই, তাঁহাদের প্রতি অনেক সময়ে ভারতবাসীদিগের কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। আমি দেখিয়াছি, ভারতবাসীদিগের প্রতি প্রকৃত সমবেদনা দেখাইলে তৎপরিবর্ত্তে তাহারা শতগুণে সম্মান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকে। ‘ইণ্ডিয়ান মিরর’ হইতে পূর্ব্বে যে প্রস্তাবের কিয়দংশ গৃহীত হইয়াছে, সেই প্রস্তাবের অন্য স্থলে লিখিত আছে :—

“ইঙ্গরেজ হইলেই যে, ভারতবর্ষীয়েরা তাহাদিগকে ঘৃণা

করে, এরূপ নির্দ্দেশ করা, সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে, যে সকল ইউরোপীয় সুযোগ পাইলেই ভারতবর্ষীয়-দিগের প্রতি অবজ্ঞা ও অনাদর প্রদর্শন করে, এবং ভারতবর্ষীয়-দিগের অবনতি ও অপকারসাধনে উদ্যত থাকে ভারতবর্ষীয়েরা তাহাদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকে। ইহাও সম্পূর্ণরূপে সত্য যে, ইউরোপীয়দিগের মধ্যে যাঁহারা ভারতবাসীদিগের উপকার-সাধনে তৎপর, তাঁহাদের প্রতি ভারতবাসীদিগের শ্রদ্ধা ও প্রীতি অসীম।"

যদি উভয় জাতির মধ্যে বিদ্বেষভাবের আতিশয্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি স্পষ্ট বলিতে পারি যে, ভারতের অধিবাসিগণ তজ্জন্য দায়ী নহে। কালের পরিবর্ত্তনে শাসক সম্প্রদায় যে অবস্থায় পতিত হইয়াছেন, তাহাতে ঐ ভাবের উৎপত্তি হইয়াছে।

সাবেক আমলের লোকদিগের সময়ে দুই জাতির মধ্যে পরস্পর সমবেদনা ছিল। এখন যে, সেরূপ নাই, তাহা অস্বী-কার করা যায় না। পূর্ব্বতন ইঙ্গরেজ রাজপুরুষগণ, কোন কোন সময়ে আত্মসম্মানে জলাঞ্জলি দিয়াও ভারতের অধিবাসী-দিগের সহিত একভাবে মিশিয়া যাইতেন। ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ অন্য কোন বিষয়ে বিভক্ত হইয়া যাইত না। তাঁহারা আপনাদের প্রবাসস্থানকেই স্বদেশ বলিয়া জ্ঞান করি-তেন। কিন্তু এখন সেই অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ঐ সকল রাজপুরুষের পরবর্ত্তী পদাধিকারিগণ আপনাদের কর্ম্ম বিরক্তিজনক ও অস্থায়ী জানিয়া সর্ব্বদা বিদায় লইয়া, ইউরোপে যাইবার সুবিধা খুজেন এবং যত শীঘ্র পারেন, কর্ম্ম হইতে অব-

সব লইয়া থাকেন। অল্পসংখ্যক লোকমাত্র অর্থোপার্জ্জন বা শীকার করিবার জন্য ভারতে ফিরিয়া আসিতে ব্যগ্র হইয়া থাকেন। ঐ দুই বিষয় ব্যতীত ইঁহাদের আর কোন বিষয়ে ভাবনা থাকে না। কিন্তু নিম্নপদের কর্ম্মচারীর অধিকাংশই ভারতবর্ষের প্রতি দিন দিন অধিকতর বীতরাগ হইয়া উঠিতেছেন। ইঙ্গলণ্ডের প্রতি তাঁহাদের টান দিন দিন বাড়িতেছে, ইঙ্গলণ্ডে যাওয়ারও অনেক সুবিধা হইতেছে। সুতরাং ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারিগণ আপনাদের জন্মভূমি প্রতীচ্য ভূখণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভারতবর্ষে কার্য্য করা কষ্টকর মনে করিতেছেন। তাঁহাদের অধীরতা এবং কার্য্য হইতে সম্মানের সহিত অবসর গ্রহণের জন্য তাঁহাদের ব্যগ্রতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতে অবস্থিতি করা তাঁহারা নির্ব্বাসনের ন্যায় ভাবিতেছেন এবং নির্ব্বাসিত হইয়াই তাঁহারা স্বদেশের জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িতেছেন। স্বদেশানুরাগ একটি সহজসিদ্ধ সংস্কার, সন্দেহ নাই। কিন্তু উপস্থিত স্থলে উহা দ্বারাই কৃষ্ণবর্ণ অধীন জাতির প্রতি সমবেদনার স্রোত নিরুদ্ধ হইতেছে।

এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ইউরোপীয় ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করিতেছেন। ইহাও ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি ইউরোপীয়দিগের উদাসীনতা বৃদ্ধির আর একটি কারণ। যখন এদেশে ইউরোপীয়দিগের সংখ্যা অল্প ছিল, ইউরোপীয়গণ যখন আত্মীয়স্বজন হইতে বিচ্যুত হইয়া এদেশে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিতি করিতেন, তখন তাঁহারা আপনাদের অবস্থার অনুশাসনে বাধ্য হইয়া ভারতের স্ত্রীপুরুষদিগের সহিত মিশিতেন। এখন যে

পরিমাণে তাঁহারা স্বজাতির সাক্ষাৎকার লাভ করিতেছেন, সেই পরিমাণে বিজাতীয়ের সহিত মিশিতে তাঁহাদের অনিচ্ছা জন্মিতেছে। ইহাতে ভারতবর্ষীয়দিগের সম্বন্ধে তাঁহারা অধিকতর অনভিজ্ঞ হইয়া উঠিতেছেন; এই অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত জাতিগত বিদ্বেষের আতিশয্য হইতেছে। ভারতপ্রবাসী ইঙ্গরেজ সম্প্রদাযেব অতি সঙ্কীর্ণহৃদয় ব্যক্তিগণও, যে সকল ভারতবাসীর সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠতা আছে, তাহাদিগকে ঘৃণা করে না, কিন্তু যাহাদিগকে তাহারা জানে না, তাহাদিগকেই ঘৃণা করিয়া থাকে।

জাতিগত বিদ্বেষের আবও অনেক কারণ আছে। সিপাহিযুদ্ধের কথা স্মৃতিপথে জাগরূক থাকাতে ইঙ্গরেজ রাজপুরুষদিগেব মন বিকৃত হইযা গিযাছে। নূতন নূতন করঘটিত বিষয়ের বন্দোবস্ত ও নানাবিধ গুরুতব কার্য্যভারেও তাঁহারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িযাছেন। পূর্ব্বে বাজপুরুষগণ আপনাদের পদগৌরব-বলে ক্ষমতার অপব্যবহাব কবিতেন, এখন সংবাদপত্রের তীব্র সমালোচনে তাহা প্রতিহত হইতেছে। হঠাৎ এইরূপ সমালোচনের উৎপত্তি হইয়াছে। এই জন্য পূর্ব্বে যে সকল রাজপুরুষ স্বেচ্ছাচারী ছিলেন, এখন তাঁহারা ক্ষমতার ন্যূনতা ও কোন কোন স্থলে তাঁহাদেব পূর্ব্বতন ক্ষমতা, সভাসমিতির হস্তে ন্যস্ত দেখিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিযাছেন। প্রায়ই শুনা যায় যে, পূর্ব্বতন ইঙ্গরেজ রাজপুরুষগণ ভারতেব ভদ্র সম্প্রদাযের সন্তোষ ও অসন্তোষের দিকে যেরূপ লক্ষ্য রাখিতেন, ইদানীন্তন রাজপুরুষগণ সেরূপ রাখেন না। বিদ্যালয় ছাড়িবার অব্যবহিত পরেই উচ্চপদে ব্রতী হইয়া তাঁহাদিগকে রাজনীতিজ্ঞোচিত গুণগরিমাপ্রকাশ করিতে

হয়। সেই অপবিণত বয়সে জনসাধারণেব বিষয়ে অথবা ভাবতেব সামাজিক অবস্থাব সম্বন্ধে তাঁহাদেব কোন অভিজ্ঞতা থাকে না। ঐ সময়ে লোকশাসনে বা লোকপবিচালনেও তাঁহাবা অসমর্থ থাকেন। এ অবস্থায় তাঁহাবা ভাবতবাসীদিগেব সহিত সজ্ঘর্ষণে আসিলে, আপনাদিগকে উচ্চপদস্থ জ্ঞান কবিয়া সহজেই তাঁহাদেব প্রতি ঘৃণাব ভাব প্রকাশ কবিয়া থাকেন। কোন অপবিণতবয়স্ক মাজিষ্ট্রেট সৌজন্য ও সদ্ব্যবহাববলে আপনাব পদ-গৌবব বক্ষা কবিতে পাবিলে যথেষ্ট সম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এরূপ স্থলে ভাবতবর্ষীয়দিগেব সহযোগিতায় স্থানীয় শাসনকার্য্য প্রায়ই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। কিন্তু ইউবোপীয় ও ভাবতবর্ষীয়গণ পবস্পব সম্মিলিত হইয়া কার্য্য কবিবেন, এই উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট সদযভাবে যে সকল সমিতিব প্রতিষ্ঠা কবিয়াছেন, অধিকাংশস্থলে ইউবোপীয় সভাপতিব অন্যায় চীৎকাবে ও ভয়প্রদর্শনে তৎসমুদয়েব কার্য্যে নানা বিডম্বনা ঘটে। এরূপ হওয়া দুর্ভাগ্যেব বিষয় বলিতে হইবে। যদি কোন ভাবতবর্ষীয় সভ্য সাহসেব সহিত স্বাধীনভাবেব পবিচয় দেন, বা সভাপতিব কোন মতেব প্রতিবাদ কবেন, তাহা হইলে তিনি অপমান ও তিবস্কাবেব হস্ত হইতে বক্ষা পাইলেই আপনাকে সৌভাগ্যান্বিত জ্ঞান কবিয়া থাকেন। ভাবতেব ভদ্রলোকেবা নীববে সভাস্থল পবিত্যাগ কবেন। তাঁহাবা আপনাদেব হৃদয়গত ভাব সভাস্থলে পবিব্যক্ত কবেন না। পাছে কোন বিভ্রাট ঘটে, এই আশঙ্কায় তাঁহাবা ভীত হন। তাঁহারা আপনাদেব মধ্যে এ বিষয়ে নানা চিন্তা কবেন এবং আপনাদেব মধ্যে এই বিষয় লইয়া বলাবলি কবিয়া থাকেন।

ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা সেই অবকাশে আমাদের গর্ব্বিত শাসনের প্রতি কোনও অংশে শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন না। ইঙ্গরেজ-সমাজে ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি প্রায়ই অবজ্ঞা ও অবমাননাসূচক ভাষা প্রয়োগ করা হয়। যখন ইঙ্গরেজ রাজপুরুষের মুখ হইতে ঐ ভাষার স্রোত বাহির হয়, তখনও উহা কম তীব্র হয় না। ইউরোপীয় পুরুষজাতি অপেক্ষা ইউরোপীয় নারীজাতি শীঘ্র জাতিগত বিদ্বেষের বশবর্ত্তিনী হইয়া পড়েন। এইজন্য ইঙ্গরেজ মহিলাসমাজে "ঐ সকল বীভৎস নেটিব," প্রায় এই বলিয়া ভারতবাসীদিগকে গালি দেওয়া হয়। ক্রোধ বা ঘৃণার ভাব না থাকিলেও পুরুষেরা কতশত বার "নিগর" শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে যেন ঐ শব্দ ছাড়া ভারতবাসীদিগের উপযুক্ত নাম আর নাই! যাহারা অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন, তাঁহারা ঐরূপ ভাষা প্রয়োগ না করিলেও উহার ভাব পরিত্যাগ করিতে পারেন না। ইঙ্গরেজ রাজপুরুষগণও ভারতপ্রবাসী বেসরকারী ইঙ্গরেজ-সম্প্রদায়ের ন্যায় ভারতবাসীদিগের প্রতি বিদ্বেষের অধীন হইয়া পড়িয়াছেন। বেসরকারী ইঙ্গরেজ-সম্প্রদায়, সহজেই স্থানীয় লোকদিগের বিপক্ষতা অবলম্বন করিয়া থাকেন। জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল এ বিষয় বিশদরূপে লিখিয়াছেন * ঃ—

"বহুদর্শিতা দ্বারা যাহা সপ্রমাণ হইয়াছে, যদি সেরূপ কোন ঘটনা থাকে, তাহা হইলে তাহা এই—যখন কোন দেশ অপরের অধীন হয়, তখন সেই পরাজিত দেশে বিজেতাদিগের স্বশ্রেণীর

* Chapter XVIII of 'Considerations on Representative Government.'

যে সকল লোক অর্থোপার্জ্জনমানসে গমন করে, সর্ব্বপ্রথমে তাহাদিগকে দমনে রাখাই আবশ্যক। তাহারা গবর্ণমেণ্টের প্রধান প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইয়া উঠে। রাজবংশীয় ও বিজেতা বলিয়া তাহাদের হৃদয়ে যে অভিমানের আবির্ভাব হয়, তাহাতে তাহাদের ক্ষমতার সম্বন্ধেই বিলক্ষণ জ্ঞান থাকে, দায়িত্বজ্ঞান কিছুই থাকে না। ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে রাজকর্ম্মচারীরা যথোচিত চেষ্টা করিয়াও প্রবলের আক্রমণ হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিতে পারেন না। যে সকল ইউরোপীয় ভারতে যাইয়া বাস করিতেছে, তাহারাই প্রবলদিগের মধ্যে অধিকতর ক্ষমতাশালী। এরূপ অবস্থায় চরিত্রগুণে সংশোধিত না হইলে, মানুষ প্রায়ই কুপথে পদার্পণ করে। ইহারাই বিজিত দেশের অধিবাসীদিগকে আপনাদের পদধূলির ন্যায় মনে করিয়া থাকে। এই অধিবাসিগণের কোন অধিকার দ্বারা যদি তাঁহাদের কোন সামান্য স্বার্থ বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে উহা তাহাদের কাছে যারপরনাই অন্যায় বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। তাহারা যে কোন ক্ষমতার অপব্যবহার আপনাদের বাণিজ্যের সুবিধাজনক বলিয়া মনে করে, তাহা হইতে অধিবাসীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কোনরূপ অনুষ্ঠান হইলে, তাহাদের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার হইল বলিয়া তারস্বরে চীৎকার করিতে থাকে। তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থায় ঐ মনোগত ভাব এরূপ স্বভাবসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে যে, শাসনকর্ত্তারা উহাঁতে কোনরূপ উৎসাহ না দেখাইলেও সর্ব্বদাই ঐ ভাবের বিকাশ হয়। গবর্ণমেণ্টের ঐ ভাব না থাকিলেও, স্বাধীন প্রবাসিগণ অপেক্ষা দেওয়ানী ও সৈনিক বিভাগের যে সকল তরুণমতি কর্ম্মচারীর উপর গবর্ণমেণ্টের অধিকতর

ক্ষমতা আছে, তাহাদের ঐরূপ বিদ্বেষভাবও গবর্ণমেণ্ট চাপিয়া রাখিতে পারেন না।”

পূর্ব্বে ভারতের সিবিল কর্ম্মচারীরা ভারতবাসীদিগের স্বত্ব-সমর্থনে বিশেষ প্রয়াস পাইতেন। ভারতবর্ষীয়েরাও মনে করিত যে, প্রবাসী ইঙ্গরেজদিগের অত্যাচার হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তাহারা সিবিল কর্ম্মচারীদিগের উপরেই নির্ভর করিতে পারে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যখন “ব্লাক্ আক্ট” (Black Act) লইয়া ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয়, সমগ্র বেসরকারী ইঙ্গরেজসম্প্রদায় যখন একসূত্রে গ্রথিত হইয়া ভারতবর্ষীয়দিগের দ্বারা ইঙ্গরেজদিগের দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার বন্ধ রাখিতে চেষ্টা করিতে থাকে, তখন সিবিল কর্ম্মচারীরাই অবিচলিতভাবে থাকিয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থন করেন। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে সিবিল কর্ম্মচারীরাই ভারতবর্ষীয়দিগের অকৃত্রিম বন্ধু ও রক্ষা-কর্ত্তা হইয়া নীলকরদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, এজন্য তাঁহা-দিগকে যারপরনাই নিন্দা ও অপবাদ সহ্য করিতে হইয়াছে। সে সময়ে “বেঙ্গল ক্লব” হইতে ইঙ্গরেজ রাজপুরুষদিগকে নিষ্কাশিত করা হইত। যেহেতু ঐ ক্লবে নীলকরেরাই অধিক পরিমাণে অবস্থিতি করিত। দুই দল ইউরোপীয় একভাবে মিলিত হইয়া আপনাদের স্বার্থরক্ষার জন্য ভারতবর্ষীয়দিগের বিরুদ্ধ পক্ষ অব-লম্বন করিবে, পূর্ব্বে তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। ভারত-বাসীদিগের মধ্যে ইঙ্গরেজী শিক্ষার বিস্তারেই এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন ভারতবাসীরা আপনাদের মতামত প্রকাশে সমর্থ হইয়াছে। শাসনসংক্রান্ত কার্য্যের অধিকতর ভার প্রাপ্ত হয়, ইহাই তাহাদের প্রধান আকাঙ্ক্ষা হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য

সরকারী কর্ম্মচারীদিগের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব বেসরকারী ইঙ্গরেজ-সম্প্রদায় অপেক্ষাও সরকারী ইঙ্গরেজ-সম্প্রদায়কে তাহাদের অধিকতর বিরোধী করিয়া তুলিয়াছে। এই দুই সম্প্রদায় ভারতবাসীদিগকে আপনাদের সমান অধিকার দিতে অনিচ্ছুক। এখন সরকারী ইঙ্গরেজ-সম্প্রদায়ই অধিকতর ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। যেহেতু পূর্ব্বে যাহা কেবল তাঁহাদেরই প্রাপ্য ছিল, এখন ভারতবর্ষীয়েরা তাহা অধিকার করিতে চাহিতেছে। যখন ভারতে বেসকারী ইউরোপীয়েরা একদিকে এবং ভারতবর্ষীয়েরা আর এক দিকে থাকিত, তখন গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ ভারতবর্ষীয়দিগের স্বার্থরক্ষার্থ ব্যাপৃত থাকিতেন। এখন সে সময় অতীতের অনন্ত স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। উহার পরিবর্ত্তে আমরা এখন কেবল ভারতবর্ষীয়দিগকে একাকী এক দিকে এবং সরকারী ও বেসরকারী ইঙ্গরেজ সম্প্রদায়দ্বয়কে অপরদিকে একসূত্রে একত্র গ্রথিত দেখিতে পাইতেছি।

ইহা ইঙ্গরেজী শিক্ষার ফল। এই শিক্ষাব ফলে দুই জাতি সমান হইয়া উঠিতেছে। যতই সমকক্ষতা ঘটিতেছে, ততই বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতের লোক ইঙ্গরেজের ভাবে যতই পরিপূর্ণ হয়, ইঙ্গরেজেরাও ততই তাহার প্রতি বিরাগ প্রকাশ করিয়া থাকে। এবিষয়ে যাহাই বলা হউক না কেন, বাস্তবিক যে সকল ভারতবর্ষীয়, বিশুদ্ধ ইঙ্গরেজী কথা বলেন, তাঁহাদের অপেক্ষা, যাঁহারা অবিশুদ্ধ ইঙ্গরেজী বলেন, তাঁহাদিগকেই ইঙ্গরেজেরা অধিক পরিমাণে উৎসাহ দিয়া থাকেন। যাঁহারা হিন্দুসমাজের কুসংস্কারের বশীভূত, ইঙ্গরেজের

নিকটে তাঁহারাই উৎসাহিত হন, কিন্তু যাঁহারা ঐ সকল কুসংস্কার ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা তত উৎসাহ প্রাপ্ত হন না। সংক্ষেপে, যাঁহারা ইঙ্গরেজের আচার ব্যবহার ও ইঙ্গরেজের চিন্তাশক্তি হইতে বহু অন্তরে অবস্থিত, তাঁহারা যেমন ইঙ্গরেজের প্রিয়, যাঁহারা ইঙ্গরেজী শিক্ষা, ইঙ্গরেজের ধারণা ও ইঙ্গরেজের চিন্তাশক্তির অধিক নিকটবর্ত্তী, তাঁহারা তত নহেন। ইঙ্গরেজেরা অনুন্নত হিন্দুকে যত ভাল বাসেন, দেশহিতৈষী উন্নত হিন্দুকে তত ভাল বাসেন না, যেহেতু অনুন্নত হিন্দুসম্প্রদায় ইঙ্গরেজের সমকক্ষতালাভে কোন চেষ্টা করে না।

ঐ সমকক্ষতা ভারতপ্রবাসী ইঙ্গরেজ, বিশেষ রাজপুরুষদিগের মনে অশান্তির সূত্রপাত করিয়াছে। প্রাচ্যভূখণ্ডে বাস করিলে ইউরোপীয়দিগের মধ্যে জাতিগত প্রাধান্য ও অসহিষ্ণুতার সঞ্চার হইয়া থাকে। যে সকল তরুণবয়স্ক ইঙ্গরেজ ভারতে প্রথম পদার্পণ করেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই ভারতবাসীদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের স্বদেশের প্রাচীন প্রবাসিগণ ভারতবাসীদিগের প্রতি যেরূপ বিরাগের ভাব দেখাইয়া থাকে, তাহাতে তাঁহাদের সদয় হৃদয়ে নিরতিশয় কষ্টের সঞ্চার হয়। তাঁহারা প্রথমে ভারতবাসীদিগের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষভাব প্রকাশ করেন না, কিন্তু শেষে কুদৃষ্টান্তের অনুশাসনে ও অবস্থাবৈগুণ্যে তাঁহাদের চরিত্র বিকৃত হইয়া যায়। তাঁহাদের মানসিক ভাবের অধোগতি হইতে থাকে। ক্রমে তাঁহারা কটূক্তি প্রয়োগ করিতে অভ্যাস করেন। অতি অল্পসংখ্যক ইঙ্গরেজই এই অধোগতি হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। আমা-

দের স্বদেশীয়গণ যখন তাঁহাদের অপেক্ষা অল্পসভ্য লোক-দিগের সহিত মিলিত হন, তখন তাঁহারা যেরূপ জাতীয় অভিমান প্রদর্শন করেন, তাহা অতি শোচনীয়। আঙ্গ্লোসাক্সণ-দিগের যে নিকৃষ্ট আত্মগরিমার চিহ্ন ইঙ্গলণ্ডে পরিস্ফুট হয়, এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের নীচশ্রেণীর ইঙ্গরেজগণ যাহা দ্বারা সকলের বিরক্তি উৎপাদন করিয়া থাকে, ভারতে তাহার অধিকতর প্রাবল্য দেখা যায়। ভারতের রাজপুরুষগণও অনুচিত তোষামোদ ও নীচ দাসত্ব-প্রিয়তায় ঐরূপ অবনত হন। আমাদের ভারতীয় প্রজাগণ এই দুর্ব্বলতার পরিপোষণ করে। তাহারা আপনাদের দেশের প্রথানুসারে উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ-দিগকে অত্যুক্তিপূর্ণ প্রশংসাবাদে মহীয়ান্ করিয়া তুলে, এবং তাঁহাদের সমক্ষে যথোচিত নীচতা প্রকাশ করিয়া থাকে। ইঙ্গরেজ রাজপুরুষগণ যদিও ইহাতে বাহিরে অসন্তোষ প্রকাশ করেন, তথাপি মনে মনে আহ্লাদিত হইয়া থাকেন। ইহার অন্যথাচরণ দেখিলে তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেও ক্রুটি করেন না। কোন একটি অন্যায় আদেশ পালন করে নাই বলিয়া, এক জন সিবিল কর্ম্মচারী একজন সিপাহিকে চাবুক মারিয়াছিলেন। আর একজনও ঐরূপ অপরাধে একজন কনষ্টবল্‌কে স্বহস্তে প্রহার করিয়াছিলেন। কেহ কেহ দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকেও আক্রমণ করিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। যেহেতু ঐ সকল সম্ভ্রান্ত লোক আপনাদের গন্তব্য পথে ইউরোপীয় দেখিয়া সম্মানপ্রদর্শন জন্য ঘোড়া হইতে নামেন নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে কোন প্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর, ভারতবর্ষীয়েরা তাঁহাদের উর্দ্ধতন ইঙ্গরেজকর্ম্মচারীদিগের সম্মুখে কিরূপ

পাগ্‌ড়ী পরিয়া আসিবে, তদ্বিষয়ে আদেশ প্রচার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, চর্ম্মপাদুকাঘটিত আন্দোলনে শত শত বার ইঙ্গরেজরাজপুরুষ-সমাজ তোলপাড় হইয়াছে। উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের বালকবৃন্দের মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতার বিকাশ দেখিয়া, ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারিগণ কত শত বার বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। সেই ক্রোধ ও বিরাগপ্রযুক্ত ঐ সকল জামাপাগ্‌ড়ীধারী বালকদিগকে অন্যায়রূপে ও হাস্যজনকভাবে অপরাধী করিয়া মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন করা হইয়াছে। ইঙ্গরেজ রাজপুরুষগণ স্বাধীনতার গৌরব রক্ষা করিতে যতই তৎপর হউন না কেন, ভারতবর্ষীয়গণ পূর্ব্বে তাঁহাদের প্রতি যেরূপ অনুচিত সম্মান ও বিনয় দেখাইতেন, তাহার কোন কোনটি উঠিয়া যাওয়াতে তাঁহাদের মনে নিদারুণ ঈর্ষার সঞ্চার হইয়াছে। কিন্তু এখন তাঁহারা ইঙ্গরেজী শিক্ষার ও পাশ্চাত্যভাবের বহুলপ্রচারে, বাধ্য হইয়া ঐরূপ পরিবর্ত্তনের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছেন। "যাহারা অনেক ইঙ্গরেজ অপেক্ষা পরিশুদ্ধ ইঙ্গরেজী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে, যাহারা মিল, কোমৎ, মোক্ষমুলর ও মেইনের গ্রন্থ পড়িয়া থাকে, যাহারা গৌরবের সহিত বিচারাসনে উপবেশন করিতেছে, করদরাজ্যের লক্ষ লক্ষ লোকের শাসনভার যাহাদের হস্তে সমর্পিত রহিয়াছে, যাহাদের কার্য্যকারিতায় কাপড়ের কল পরিচালিত হইতেছে এবং বাণিজ্যসংক্রান্ত প্রধান প্রধান কার্য্য সম্পন্ন হইয়া উঠিতেছে, যাহারা ইঙ্গরেজীতে সংবাদপত্র চালাইতেছে এবং ইউরোপের পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত সমকক্ষভাবে চিঠিপত্র লেখালেখি করিতেছে, তাহাদের সহিত নীচজনোচিত ব্যবহার করা যাইতে পারে

না *।” তাহারা স্বাধীনতাবাদী। তাহারা শাসকবর্গের সহিত সমান অধিকারের দাবী করিয়া থাকে। স্বদেশের শাসনকার্য্যের সহিত অধিক পরিমাণে সম্বন্ধ জন্মে, ইহাই তাহাদের ইচ্ছা। তাহারা পথে কোন ইউরোপীয়কে দেখিলে সেলাম করে না এবং কাহারও সমক্ষে উপস্থিত হইতে হইলে জুতা ছাড়িয়া যায় না। তাহাদের এইরূপ ব্যবহারে, জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, ইউরোপীয়দিগের মনে বড় বিরাগের সঞ্চার হইয়াছে। শাসকসম্প্রদায়, এইরূপ ব্যবহারে বেয়াদবী বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কোন ইঙ্গরেজ সিবিল কর্ম্মচারী এই বলিয়া থাকেন :—“ভারতবর্ষীয়-দিগের প্রতি আমার যেরূপ সদয়ভাব আছে, এরূপ আর কাহারও নাই। আমি উহাদিগকে ভাল বাসি। জনসাধারণ আমার প্রিয়। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের লোকদিগকেও আমি ভাল বাসিয়া থাকি। কিন্তু আমি ‘বাবু’দিগকে দেখিতে পারি না।” এই কথাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অসন্তোষের কারণ অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে সীমাবদ্ধ। বাবুগণই ইঙ্গরেজী শিক্ষার ও ইঙ্গরেজী সভ্যতার ফল। ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উচ্চাশা, উচ্চতর ধারণার সহিত ভারতের সিবিল কর্ম্মচারীদিগের কোন-রূপ সমবেদনা নাই। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষভাব এখন সকল ইউরোপীয়ের মধ্যে সমভাবে বিকাশ পাইতেছে। ইলবর্ট বিলের আন্দোলন এই বিদ্বেষভাবের পরিস্ফুট লক্ষণ। বলিতে লজ্জা হয় যে, আমার স্বশ্রেণীর কর্ম্মচারীরাই ইলবর্ট

* আমি সন্তোষসহকারে আমার ভ্রাতার লিখিত “ভারতবর্ষ” শীর্ষক প্রস্তাব হইতে এই অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

বিলের প্রধান বিপক্ষ হইয়াছিলেন। নীলকর, বাণিজ্যব্যবসায়ী এবং আইনব্যবসায়ী ইউরোপীয়দিগের ন্যায় জেলার মাজিস্ট্রেট ও জজেরাও সমভাবে উহার বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন।

মূলরক্ষণ ও মিতব্যয়িতা।

রাজ্যশাসনের যে প্রণালীতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্যবিভাগে এক এক জন স্বতন্ত্র অধ্যক্ষ থাকেন, সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে কেবল ভারত গবর্ণমেণ্টই তাহার একটি পূর্ণ আদর্শ। এই ধর্ম্মাক্রান্ত অন্যান্য রাজ্যশাসন-প্রণালীর ন্যায় ভারত গবর্ণমেণ্টের রাজপুরুষেরা আপনাদের কার্য্যক্ষমতার সীমা বৃদ্ধিদ্বারা স্বীয় অস্তিত্বের প্রয়ো-জনীয়তা সপ্রমাণ করিয়া থাকেন। রাজকর্ম্মচারীদিগের এইরূপ সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা এখন একটি গুরুতর দোষ হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে ভারতের রাজকর্ম্মচারীরা শাসনকার্য্যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিতেন। তাঁহারা অতি সাবধানে সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন এবং বেশী বাড়াবাড়ি না করিয়া পূর্ব্বাপর মত সকল রক্ষা করিয়া চলিতেই ভাল বাসিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষার বিস্তার, রাজনৈতিক মতের উন্নতি ও জাতীয় ভাব পরিপুষ্টির যেরূপ অনেক সুবিধা ঘটিয়াছে, সেই-রূপ শাসনসংক্রান্ত কার্য্যবিভাগের অনেক বৃদ্ধি হওয়াতেও প্রকৃত উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হইতেছে। রাজ্যমধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং মানুষের সদসৎ প্রবৃত্তির উৎসাহ দেওয়া জ্ঞানী রাজনীতিজ্ঞের কার্য্য; কিন্তু ভারতে যাহা আবশ্যক তাহা এই:—গবর্ণমেণ্টের যেখানে যেটি সুসংবদ্ধ বিষয় হওয়া উচিত, সেখানে সেইটি ঘটাইতে হইবে, আর অনাবশ্যক কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে হইবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভূখণ্ডে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যে গুরুতর পার্থক্য আছে, তাহা বুঝিতে

হইবে এবং প্রধানতঃ শাসিত জনসাধারণের সঙ্কল্প ও স্বার্থের সহিত যথোচিত সমবেদনা রাখিতে হইবে। যদি ভারতের শাসকবর্গের এই সকল গুণ আছে বলিয়া, স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে আমাদিগকে প্রকৃত উন্নতিতে হতাশ হইতে হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ সকল গুণ এখন বড় দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে, এবং উহাদের স্থলে বিদ্বেষ, বিসংবাদের নিকট ভাব স্থান পরিগ্রহ করিতেছে। উন্নতাকাঙ্ক্ষ রাজপুরুষেরা অল্প দিনের জন্য এদেশে কার্য্য করিতে আসিয়া আপনাদের খামখেয়ালীর উপর কাজ করিয়া, প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ঐ কাজ প্রজাসাধারণের মনোমত কি না, তাহার দিকে তাঁহারা কিছুই দৃষ্টি রাখেন না। তরুণবয়স্ক, চঞ্চলমতি রাজপুরুষেরা গবর্ণমেণ্টের নিকট যেরূপ অশান্তিজনক প্রস্তাব করিয়া থাকেন, তাহাতে আমার হৃদয়গত আশঙ্কা আপনা হইতেই প্রকাশ হইয়া পড়ে। আমার বড় আশঙ্কা যে, আমরা উন্নতি ও সংস্কারের ইচ্ছায় এরূপ আইন বিধিবদ্ধ ও প্রচারিত করিয়া থাকি যে, তৎসমুদয়ের সুফল অনিশ্চিত। পক্ষান্তরে তৎসমুদয় দ্বারা যে, শান্তির ব্যাঘাত এবং সর্ব্বশেষে অবনতির একশেষ হইবে, তাহা নিশ্চিত। আমরা সকল বিষয়েই গোলযোগ ঘটাইতেছি। জনসাধারণ পূর্ব্বে আমাদের অভিপ্রায়ের যে নির্ম্মলভাবের প্রশংসা করিত, তাহা ইলবর্ট বিলের আন্দোলনে তাহাদের নিকট কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

যে দেশে উচ্চবংশীয় ধনী সম্প্রদায় এখনও শান্তির মূল ভিত্তিস্বরূপ রহিয়াছেন এবং যে দেশে ভূম্যধিকারী সম্প্রদায় পুরুষানুক্রমে অভ্যন্তরীণ শাসন-নীতির পুনর্গঠনজন্য সেই ভিত্তি রক্ষা

করিতেছেন, সে দেশের অনুপযোগী কৃষিসম্বন্ধীয় মতসকল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য, প্রবর্ত্তিত করাতে সপ্রমাণ হইতেছে যে, বর্ত্তমান অবস্থার পরিজ্ঞানে আমরা সম্পূর্ণ অসমর্থ। এই পরীক্ষা-কার্য্যে শান্তভাবে বিবাদবিসংবাদ না মিটিয়া, বরং উভয় দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও তৎপ্রযুক্ত নানা গোলযোগ উপস্থিত হইতেছে। প্রজাভূম্যধিকারীসংক্রান্ত যে আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা যদিও অনেক বিষয়ে ভাল, তথাপি যে দেশে ঐ আইন প্রচলিত হইয়াছে, তাহার সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখা হয় নাই। বাঙ্গালার জমীদার ও রায়তের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে, তাহা কেবল ভূস্বামী ও প্রজাঘটিত সম্বন্ধ নয়। জমী-দারেরা কেবল খাজানা আদায় করেন না, এবং প্রজারাও কেবল সেই খাজানা দেয় না। বাঙ্গালার ভূমিসংক্রান্ত প্রণালীর সামাজিক লক্ষণ আয়র্লণ্ড, ইঙ্গলণ্ড বা অন্য কোন দেশের তুল্য নহে। জমীদার ও প্রজার মধ্যে রাজাপ্রজার সম্বন্ধ রহিয়াছে। বঙ্গের অধিকাংশস্থলেই যে, বিবাদ, বিসংবাদ, অত্যাচার ও দারিদ্র্য রহিয়াছে, তাহা কখনই বলা যাইতে পারে না। সত্য বটে, অনেক স্থলে ন্যায়ানুগত স্বত্ব নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, বাকী খাজানাও ঠিক করা হয় নাই, এখনকার দাবীও নির্দ্ধারিত হইয়া উঠে নাই, এবং চাষের জমির পরিমাণও ঠিক জানা যায় নাই, তথাপি জমীদার ও প্রজার মধ্যে সাধারণতঃ কোন অসদ্ভাব নাই। সময়ে সময়ে জমীদারপ্রজা-ঘটিত যে সকল গোলযোগ স্থানীয় কর্ম্মচারীদের গোচর হয়, সেই সকল গোলযোগ হইতে উক্ত কর্ম্মচারিগণ যে সঙ্কীর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহাতে তাঁহাদের বিষম ভ্রম জন্মে। গবর্ণমেণ্টও তাঁহাদের ন্যায় ভ্রমে

পতিত, হইয়া বিশ্বাস করেন যে, সাধারণের মধ্যে অসদ্ভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। দুই একটি গোলযোগেই তাঁহাদের মন আকৃষ্ট হয়, কিন্তু সহস্র সহস্র স্থলে যে, শান্তি ও শৃঙ্খলা বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের দৃষ্টি পতিত হয় না। যে বর্ত্তমান অবস্থা দেশাচারের অনুমোদিত, যাহাতে কাহারও কোন আপত্তি উত্থাপিত হয় না, রাজপুরুষেরা অনুচিতরূপে হস্তার্পণ করাতে তাহা বড় অব্যবস্থিত হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল রাজকর্ম্মচারী হিতৈষিতার বশবর্ত্তী হইলেও আপনাদের কুসংস্কারপ্রযুক্ত একটি সম্প্রদায়ের সমস্ত লোককে দুঃস্বভাব ও অনিষ্টকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সঙ্কুচিত হন না। যে পরিবর্ত্তন পরিণামে অবশ্য ঘটিবে, তাহা যে, দেশের অবস্থানুসারে আপনা-হইতেই হইবে, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। রাজকর্ম্মচারীরা সময়ে সময়ে অবিজ্ঞের ন্যায় এরূপ কার্য্য করেন যে, তাহাতে জমীদার ও প্রজার মধ্যে গোলযোগের সূত্রপাত হয়। এই গোলযোগ অযথারূপে একটি বৃহৎ ব্যাপার বলিয়া পরিগৃহীত হয়। এই সকল কর্ম্মচারীও গবর্ণমেণ্টের নিকট যথোচিত উৎসাহ পাইয়া থাকেন। বঙ্গের বিভাগে বিভাগে এখন সুখ ও শান্তি বিরাজ করিতেছে। কিন্তু নূতন আইন প্রচলিত হওয়াতে যে সকল রাজকর্ম্মচারী রাজস্ব আদায়ে নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদের আবির্ভাবে আর সে সুখ ও শান্তি থাকিবে না। প্রজাদের বিষয়ে, যতদূর কম সম্ভব, হস্তার্পণ করাই গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্বতন নীতি ছিল। এখন সেই নীতি পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিলে নানা গোলযোগের উৎপত্তি হইবে, বিরোধ ঘটিবে, এবং মোকদ্দমার প্রাদুর্ভাব হইবে। পূর্ব্বে যাহা

পরিবর্ত্তনশীল ও অনিশ্চিত ছিল, অভিনব আইন অনুসারে তাহা স্থির ও নিশ্চিত হওয়াতে উভয় পক্ষই বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা চালাইবে। যদি আমিন ও ভূমির বন্দোবস্তসংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণ কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত না হইতেন, তাহা হইলে কখনই ঐ সকল মোকদ্দমার উৎপত্তি হইত না। উপস্থিত বিষয়ে আমাদের হস্তার্পণে উভয় পক্ষে যে, কিরূপ অসদ্ভাব জন্মিবে, তাহার অতিরঞ্জন সম্ভব নহে। উহা হইতে কোনরূপ সুবিধা হউক বা না হউক, অপকার অধিক হইবে। আমরা যে আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছি, তদ্দারা উভয় পক্ষের বিরোধের মীমাংসা হউক বা না হউক, নিঃসন্দেহ নূতন নূতন বিরোধের উৎপত্তি হইবে। যাঁহারা দূরদর্শিতা ও অভিজ্ঞতাবলে উপস্থিত বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করিতে সক্ষম, আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, তাঁহারা আমার সহিত একমত হইবেন।

দেশের অর্থনীতি-ঘটিত বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট অন্যায়রূপে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন। ফরাসী দেশের ছোট ছোট কৃষিক্ষেত্র ও ইঙ্গ-লণ্ডের জোতজমার মধ্যে যেরূপ পার্থক্য আছে, ভারতবর্ষের কৃষিঘটিত অবস্থার একটির সহিত আর একটির সেইরূপ পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য সত্ত্বেও আমরা সমস্ত কৃষিভূমি, সমস্ত জোত ও সমস্ত বন্দোবস্তপ্রণালী প্রোকস্তসের শয্যার * মত এক

* গ্রীশদেশীয় দস্যু প্রোকস্তসের একখানা খাটিয়া ছিল। সে পথিক ধরিয়া আনিয়া তাহাতে শোয়াইত। খাটিয়ার অপেক্ষা পথিক ছোট হইলে, সে তাহাকে টানিয়া বাড়াইয়া বাঁধিয়া দিত। বড় হইলে, হাত পা কাটিয়া খাটিয়ার মত করিয়া দিত। গ্রন্থকারের ভাব এই যে, প্রোকস্তস্ যেমন, ছোট

পর্য্যায়-ভুক্ত করিয়া থাকি। "দখলীস্বত্ববান্ রায়ত," এবং "তালুকদার" এই দুইটি কথা বঙ্গদেশের, অভিনব বন্দোবস্ত-প্রণালীর মধ্যে ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে। এক প্রদেশের এক অংশে যাহা প্রয়োজিত হইতে পারে, তাহাই যে, সমস্ত প্রদেশের পক্ষে যোগ্য, আইনকর্ত্তাদের এইরূপ কল্পনাই আমাদের সমস্ত অনর্থের মূল হইয়াছে। সকল বিষয়েই 'সামঞ্জস্য ঘটিবে, যদি আমরা অন্ধভাবে এই মত পোষণ করি, তাহা হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে নানা গোলযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। এই জন্যই গবর্ণমেণ্টের উপস্থিত কার্য্যে চাবিদিকে ঘোরতর অসন্তোষ ও অশান্তির বিস্তার হইতেছে। সহস্র সহস্র বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সহিত প্রজাদের বিরোধ ঘটিতেছে। রাজস্ববিভাগের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীরা কলিকাতার প্রকাশ্য পথে হতাশ প্রজাগণে পরিবেষ্টিত হইতেছেন। ইহাতে পূর্ব্বতন বন্দোবস্ত সংশোধন করিতে, করভার কমাইতে এবং যে রাজস্বঘটিত দাবী পরিত্যাগ করা উচিত নহে, তাহাও পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। আমি এ স্থলে একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। ঐ বিষয়ে আমার বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। কয়েক বৎসর ধরিয়া চট্টগ্রামে নয়াবাদ বন্দোবস্তসম্বন্ধে অনেক আন্দোলন হইয়াছে। ঐ বিভাগে যে সকল পতিত জমী আবাদ করা হইয়াছে, তাহার কর-নির্দ্ধারণসম্বন্ধে একরূপ রীতি একশত বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া একভাবে চলিয়া আসিয়াছিল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট একটি নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার

বড় সকলকেই এক খাটিয়ায় শোয়াইত, গবর্ণমেণ্টও তেমন বিভিন্ন প্রকৃতির কৃষিভূমি প্রভৃতি এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া থাকেন।—অনুবাদক।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ প্রণালী এখন সম্পূর্ণরূপে উল্টাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যখন আমি এই পরিবর্ত্তনের প্রতিবাদ করি, তখন, গবর্ণমেণ্ট ভবিষ্যৎ বন্দোবস্তের সময়ে প্রাচীন নিয়মের অনুসরণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন কিনা, তাহা দেখাইয়া দিতে বলা হয়। আমি সে সময়ে যাহা বলিয়াছিলাম, এখনও তাহাই বলিতেছি যে, আমি ঐ বিষয় দেখাইয়া দিতে বাধ্য নই। যদি স্বীকার করা যায় যে, ঐ সকল বন্দোবস্ত একই প্রণালীতে হইয়াছে, তাহা হইলে ভবিষ্যতের বন্দোবস্ত যে, ঐ প্রণালীতে সম্পন্ন হইবে, তাহা দেখাইবার ভার কাহারও উপর থাকে না। শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে পারম্পর্য্য রক্ষা করা উচিত। যে পূর্ব্ব নিদর্শন এবং আচার ও স্বত্ব গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্বাধিকারীরা মানিয়া গিয়াছেন, কি বর্ত্তমান, কি ভবিষ্যৎ, সকল গবর্ণমেণ্টেরই তাহা মানিয়া চলা উচিত। আমাদের রাজস্বপ্রণালীর সর্ব্বদা যে সকল পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব হয়, তাহা অত্যন্ত দোষাবহ। আমরা ঐ সকল প্রস্তাবের পরীক্ষা করিতে গিয়া প্রজাবর্গের সমূহ অপকার সাধন করিয়া থাকি। "ঐ সকল পরিবর্ত্তনে প্রজাদিগের অনুমাত্রও ক্ষতি হইবে না, ইহা কি কেহ অনুমান করিতে পারেন?" এইরূপ প্রশ্ন লইয়া রাজপুরুষদিগের ব্যাপৃত থাকা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমাদের রাজস্ববিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে অনাদর প্রদর্শন করেন, অথবা উহা আদেশলিপিসমূহেই নিবদ্ধ করিয়া রাখেন। ঐ সকল আদেশলিপিতে নানা ভারগ্রস্ত কৃষিজীবীরা অধিকতর গোলযোগে পড়িয়া থাকে।

এইরূপ স্বেচ্ছাচারিতামূলক পদ্ধতি অপেক্ষা আর একটি

বিষয় অধিকতর উদ্বেগের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। বিষয়টি এই :—এখন আমাদের রাজস্বনীতিতে এই সংস্কার দাঁড়াইয়াছে যে, এদেশের ভূমি এদেশের অধিবাসীদিগের নহে, উহা গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি। যখন জনসাধারণই গবর্ণমেণ্টের অপর নাম, তখন ভূসম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত, এরূপ বলায় বিশেষ কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু যদি অল্পসংখ্যক বিদেশীয়-দিগকে গবর্ণমেণ্ট বুঝায়, তাহা হইলে আর একরূপ হইয়া উঠে। এই বিদেশিগণ তাঁহাদের ভূসম্পত্তি হইতে যাহা প্রাপ্ত হন, তাহার তিন ভাগের একভাগ আপনাদের কর্ম্মচারী-দিগের বেতনস্বরূপ ব্যয় করেন। তাঁহারা এদেশে স্থায়ীরূপে বাস করেন না, এদেশেব অদৃষ্টের সহিতও তাঁহাদের বিশেষ কোন সংস্রব নাই। ভারতের যে সকল বিভাগে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, সেই সকল বিভাগ ব্যতীত আর সকল স্থলে আমরা এই নীতি প্রবর্ত্তিত করিযা প্রজাদিগকে গুরুতর দারিদ্র্য-গ্রস্ত করিয়া তুলিযাছি। যে একদল বিদেশী লোক আপনা-দিগকে গবর্ণমেণ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তাহারাই প্রকৃতপ্রস্তাবে ভারতের ভূস্বামী, এই ভ্রান্ত মত সমর্থন করিয়া আমরা তালুক-দার হইতে রায়ত পর্য্যন্ত, সকলেরই ভূসম্পত্তিগত অধিকার নষ্ট করিয়াছি। আমরা পল্লীসমাজের সমস্ত শৃঙ্খলা পর্য্যুদস্ত করিয়া ফেলিয়াছি। অর্থনীতির যে সকল বন্ধনে ভারতের কৃষিজীবিগণ আবদ্ধ ছিল, তাহা বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছি। উহার পরিবর্ত্তে বহুব্যযসাধ্য প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছি। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী মোগল সম্রাটেরা অতি সহজ নিয়মে রাজস্ব আদায় করিতেন। ঐ সকল প্রক্রিয়া রাজ্যশাসনের সঙ্গে সঙ্গে

আপনা হইতেই বিকাশ পাইত, এবং উহা আবহমানকাল ধরিয়া নির্দ্ধারিত ছিল। আমরা মোগল কর-সংগ্রহকারকদিগের কাঠিন্য ও নিষ্ঠুরতার অনেক বর্ণনা করি। কিন্তু প্রজাদের স্থানান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকাতে ঐ কাঠিন্য ও নিষ্ঠুরতার বেগ মন্দীভূত হইত। এতদ্দ্বারা অত্যাচারী জমীদারদিগের উৎপীড়নও দমনে থাকিত। যাহারা করবৃদ্ধিকরণে ও কর-সংগ্রহে নিযুক্ত হইত, তাহাদের স্বার্থচিন্তা, স্বেচ্ছাচারী প্রাচ্য ভূপতিদিগের পরস্বলুণ্ঠনের পথ অনেকাংশে নিরুদ্ধ রাখিত। আমরা পূর্ব্বতন বন্দোবস্তের স্থলে যে কঠিন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছি, তদ্দ্বারা লোকের অসন্তোষ বৃদ্ধি হইযাছে। ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্টের পুরাতন কাগজপত্র এ বিষয়ে, সাক্ষ্য দিতেছে *। সকল বিষয়ে সম্পূর্ণতা লাভ করিতে গিয়া এবং সকল বিষয় সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বুঝিতে গিয়া, আমরা কেবল গোলযোগের উৎপত্তি করিযাছি। কেবল বঙ্গদেশের অনেক স্থলে চিরস্থায়ী

* ডাক্তর বুকানন্ সাহেবের 'ষ্টাটিস্‌টিকাল সার্ব্বে' নামক গ্রন্থের ৪র্থ পরিচ্ছেদের সপ্তম অধ্যায়ে দিনাজপুর জেলার সম্বন্ধে যে বিবরণ আছে, তাহাতে এ বিষয়ের ভাল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। উহাতে লিখিত আছে;— "স্থানীয় লোকেরা নির্দ্দেশ করে যে, যদিও মোগল সরকারের কর্ম্মচারীরা তাহাদিগকে সর্ব্বদা নিপীড়ন করিত এবং সকল সময়েই তাহাদের উপর যার-পরনাই ঘৃণা প্রকাশ করিত, তথাপি তাহারা দেনার দায়ে ভূমি বিক্রয় করা অপেক্ষা ঐসকল অত্যাচার ভাল বাসে। বর্ত্তমান প্রণালী তাহারা কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বে তাহাদিগকে অনেক ঘুষ দিতে হইত। তাহারা বলে যে, এখন তাহাদিগকে যাহা দিতে হয় পূর্ব্বে উৎকোচ সমেত তাহার অর্দ্ধাংশও দিতে হইত না।"

ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় প্রজাদিগের কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, কর্ণেল অস্‌বোর্ন্ তাহার বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি মেজর ইবান্স-বেল সাহেবপ্রণীত সেনাপতি ব্রিগ্‌সের জীবনীতে 'ভারতে ভূমির কর' নামে যে অধ্যায় লিখিয়াছেন, তাহাতে এবিষয় উৎকৃষ্টরূপে আলোচিত হইয়াছে।

বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাতে প্রজাসাধারণ দারিদ্র্যগ্রস্ত হয় নাই। এজন্য দুর্ভিক্ষ নিবারণের কোন উপায়ের প্রয়োজন হয় নাই। যদি করবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে কৃষকগণ ভূমির উন্নতিসাধনে বা চাষ-বাসের সম্প্রসারণে যত্ন করে না। এরূপ স্থলে নির্ভাবনার কোন কারণ থাকে না। জমীর সম্বন্ধে নির্ভাবনাই ধনী ও বুদ্ধিমান্ লোকদিগকে কৃষিকার্য্যে আকৃষ্ট করিয়া থাকে। এখন কৃষক-দিগের কেবল কোনরূপে ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হয়, অতিরিক্ত কিছুই থাকে না। ইহাতে বর্ষে বর্ষে ঋণ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ ঘটিয়া নানা কষ্টের সঞ্চার করিতেছে।

ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে প্রায় সকল লোকই কৃষিজীবী। এজন্য ভূমিসংক্রান্ত সকল কথাই এখানকার লোকের বিশেষ মনোযোগের বিষয়। অধিকন্তু ভাল বিষয়ই হউক, বা মন্দ বিষ-য়ই হউক, গবর্ণমেণ্ট এদেশে যাহা করেন, তাহার ফল সুদূর-ব্যাপী হইয়া থাকে। এই পরিবর্ত্তনের যুগে কেবল এই বিষয়েই হস্তার্পণে বিরত থাকা অধিকতর প্রয়োজনীয়। এখন শান্তি স্থাপন করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে জনসাধারণ যাহাতে আপনাদের পরিপুষ্টি ও পরিচালনের জন্য বুনিয়াদী সম্প্র-দায়ের উপর সহজে নির্ভর করিতে পারে, তাহার সুযোগ করিয়া দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। কৃষকেরা বহুকষ্টে যে ফলসম্পত্তি সংগ্রহ করে, তাহা বলপূর্ব্বক গ্রহণে বিরত থাকা উচিত, এবং যে সকল কল্পনাময় রীতি, সমূহ বিরক্তি ও গোলযোগের উৎপত্তি করে, তাহা প্রচলিত করিতে নিরস্ত থাকা বিধেয় *।

*আমি আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের কৃষি-

কেবল ভূমিসংক্রান্ত বিষয়েই যে পরিবর্ত্তনশীল নীতি মন্দ, আমি তাহা বলিতেছি না, রাজ্যসংক্রান্ত বিষয়ে রাজপুরুষদিগের হস্তক্ষেপের কথা বলিতে গেলে আমি ইহাই বলিব যে, 'আমার

বিভাগের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এখন আর কৃষিকার্য্যের অনুসন্ধান স্বরূপ হইতে চাহেন না। শৃঙ্খলার সহিত কৃষিসংক্রান্ত বিষয়ের বন্দোবস্ত করাই এখন কৃষিবিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়াছে। ইহাতে কৃষিবিষয়ে ভারতবর্ষীয়দিগের বুদ্ধির বিকাশ হইবে। এই বুদ্ধির গুণে কেবল ব্যবহারিক কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষ হইবে না, সারগর্ভ আইনও বিধিবদ্ধ হইবে। বাঙ্গালায় ভূম্যধিকারী ও প্রজার স্বত্ব আইন যাহাই হউক না কেন, উহা অজ্ঞতা ও বিশৃঙ্খলার সহিত তথ্যানুসন্ধানের ফল। যদি রাজস্ব ও কৃষিবিভাগ এতদ্বিষয়ক জ্ঞানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিত এবং ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোকদিগকে অভিজ্ঞ করিয়া কৃষকদিগের উন্নতিসাধনে তাঁহাদের সমবেদনা উদ্দীপিত করিয়া দিত, তাহা হইলে উহার সৃষ্টি নিরর্থক হইত না, কিন্তু বলা বাহুল্য যে, যখন ঐ বিভাগ প্রথমে স্থাপিত হয়, তখন উহার উদ্দেশ্য উক্তরূপ ছিল না।

কৃষিবিভাগের যে সকল কর্ম্মচারীর হস্তে দায়িত্বভার রহিয়াছে, তাঁহাদের লর্ড রিপনের মন্তব্যলিপির (১৮৮১ অব্দের ৮ই ডিসেম্বরের) এই অংশ কখনও বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে—'ভারত গবর্ণমেণ্ট এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন যে, ভারতবর্ষের যে সম্প্রদায় অকপটভাবে কৃষিসংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ যত্ন প্রকাশ করেন, কৃষিবিভাগ কৃষিকার্য্যের উন্নতিপ্রসঙ্গে প্রথমেই তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করিবেন। কেবল ভারতবাসীদিগের সাহায্যেই প্রকৃতপ্রস্তাবে কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষ হইতে পারে। কৃষিকার্য্যের উন্নতির বিষয়ে ভারতবর্ষীয়দিগের দূরদর্শিতা ও সুবিধা আছে ইংরেজ রাজপুরুষদিগের উহা নাই। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষীয়গণ অনেক স্থানে কৃষিকার্য্যের জন্য অনেক টাকা খাটাইতে পারেন। ইঁহারা কৃষকদিগের আচার ব্যবহার জানেন। ভারতের কৃষিকার্য্যের বর্ত্তমান প্রণালীর সম্বন্ধে ইঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে। যে সকল স্থানীয় কার্য্যকারণ ইউরোপীয় দর্শকদিগের নিকটে যুক্তিবহির্ভূত ও বিস্ময়জনক বোধ হয়, তাহা ইঁহারা ভালরূপে বুঝেন। এইজন্য ইঁহারা প্রচলিত ঘটনার কোন ব্যতিক্রম না ঘটাইয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতিবিধানে এবং বিদেশীয় ভাবে কৃষিকার্য্যের উন্নতির উপায় অবলম্বন করিলে, যে প্রণালী ও যে ধারণা বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়, তাহার উচ্ছেদ না করিয়া, দেশীয় অবস্থার উৎকর্ষসাধনে অধিকতর সমর্থ।"

মতে কোন বিষয়ই তাড়াতাড়ি না করিয়া ধীরভাবে প্রতীক্ষা করা উচিত। স্থানীয় লোকে কোন সদ্বিষয়ে যত্ন করিলে তাহার পরিবর্দ্ধন ও পরিরক্ষণ করা, স্থানীয় লোকের ঐরূপ চেষ্টা পুনর্জীবিত করা, এইরূপ কার্য্যপ্রণালীতে প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে বিশ্বাস উৎপাদন করা এবং শেষে যে রাজনীতি দিন দিন দৃঢ়তর হইয়া স্থায়ীভাবে থাকিবে, সেই রাজনীতি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। আমার এই কথা বিশেষ বিশেষ বিষয়ে প্রযোগ করা সহজ। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি যে আত্মশাসন আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে উহা বিশেষরূপে প্রযোজিত হইতে পারে। স্থানীয় আত্মশাসনপ্রণালী প্রথমে কতিপয় মনোনীত স্থানে প্রবর্ত্তিত করিয়া ক্রমে অন্যান্য স্থানে সম্প্রসারিত করিতে হইবে। কিন্তু সকল স্থলেই উহা সম্পূর্ণ বিশ্বস্তভাবে ও অসঙ্কুচিতচিত্তে প্রবর্ত্তিত করা উচিত। উহা সকল স্থলে একবারে পূর্ণমাত্রায় চালাইলে এবং উহার উপর নানারূপ বাধা চাপাইয়া দিলে কখন ফল লাভ করা যাইবে না। যদি স্থানীয় রাজপুরুষেরা প্রত্যেক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে স্থানীয় আত্মশাসনের পূর্ণবিকাশ হওয়া অসম্ভব। এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কিরূপ সাহায্য করা ও উৎসাহ দেওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে লর্ড রিপন এইরূপ বলিয়াছেনঃ—"কমিসনরগণ যাহাতে ন্যায়পথ অতিক্রম না করিয়া আপনাদের মতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন, তাঁহাদের আত্মনির্ভরের ভাব যাহাতে সঙ্কুচিত না হয়, তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট যত্নশীল হইবেন।" স্থানীয় আত্মশাসনের মূলনীতি এইরূপ। ভারতগবর্ণমেণ্টের যে সকল ব্যবস্থাপকের যত্নে আত্মশাসন-প্রথা উদ্ভাবিত হয়, তাঁহারা এইরূপে আপনাদের মত পরিব্যক্ত করিয়াছিলেন। যে

নীতি উহার বিপরীত পথে ধাবমান হয় এবং বিশেষ বিশেষ ঘটনায় বাহিরের লক্ষণ দেখিলেই যাহা উহার স্বাভাবিক স্ফূর্তি নষ্ট করিবার জন্য কল্পিত বলিয়া বোধ হয়, অথচ কোন স্থানীয় কার্য্যে যে নীতি আপাততঃ উৎসাহ দেয় বলিয়া প্রতীত হয়, সেই নীতির যতদূর সম্ভব, অভিসম্পাত করা উচিত।

ভারতবাসীদিগের স্বাভাবিক শক্তির পরিপুষ্টির জন্য, এখন রাজপুরুষদিগের অধীনতা হইতে বিমুক্ত থাকা অতি আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এই বিষয়ে স্পষ্টরূপে যতই বলা হউক না কেন, কিছুতেই তাহা পর্য্যাপ্ত হয় না। ইহা গবর্ণমেণ্টের উচ্চাভিলাষী, একাগ্রচিত্ত, পরামর্শদাতাদের এরূপ ঘৃণার্হ যে, ইহার বিষয় উল্লেখ করা অত্যন্ত আবশ্যক। লর্ড এলগিন্ এক সময়ে ঐ সকল পরামর্শদাতার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, উহারা কেবল গোলযোগ বাধাইতেই স্বভাবতঃ তৎপর। ইহার সঙ্গে সঙ্গে মিতব্যয়িতার প্রতি দৃষ্টি রাখাও আবশ্যক। শাসনবিভাগের রাজপুরুষদিগের ক্ষমতাহ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই বিভাগে মিতব্যয়িতা বৃদ্ধি করা উচিত। ইঙ্গরেজকর্ত্তৃক ভারতশাসনে বড় ব্যয়বাহুল্য ঘটে। ইহা একটি প্রধান দোষ। সকল সময়েই, বিশেষ যখন ভারতসাম্রাজ্য মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শাসনাধীন হইয়াছে, তখন হইতেই আয় অপেক্ষা শাসনকার্য্যের ব্যয় বাড়িয়াছে। সকল সময়েই ভারতের ইঙ্গরেজরাজের ধনভাণ্ডারে অনাটন ঘটে। কোন সময়ে এক বৎসরের সকল খরচ নিয়মিত বার্ষিক আয় দ্বারা নির্ব্বাহ হয় না। দুই এক বার ব্যয়বাদে উদ্বৃত্ত ও ঋণহ্রাসের কথা শুনা যায় বটে, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে

উহা পীর্হসের জয়ের ন্যায় *সাতিশয় নিরাশজনক বলিয়া প্রতীয়-

* পীরহস্ প্রাচীন গ্রীশের উত্তরপশ্চিম ভাগ ইপাইরসের রাজা। খ্রীঃপূঃ ৩১৮ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। অদৃষ্টের বহুবিধ পরিবর্ত্তনের পরে তিনি ২৯৫ অব্দে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। খ্রীঃ পূঃ ২৮০ অব্দে তাঁহার জীবনের একটি প্রধান স্মরণীয় ঘটনা হয়। ঐ সময়ে রোমকের ইটালির অন্তঃপাতী তারেন্তাম্ প্রদেশের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ উপস্থিত করাতে তারেন্তামবাসীরা পীরহস্কে আপনাদের সেনাপতির পদ সমর্পণ করে। পীর্হস খ্রীঃ পূঃ ২৮০ অব্দে ২০,০০০ পদাতি, ৩,০০০ অশ্বারোহী, ২,০০০ ধনুর্দ্ধারী, ৫০০ ফিঙ্গা-পরিচালক এবং ২০টি হস্তী লইয়া তারেন্তামে যাত্রা করেন। রোমকদিগের সহিত পীর্হসের তুমুল যুদ্ধ বাধে। বহুক্ষণব্যাপী সংগ্রামে উভয় পক্ষের সৈন্যদল সাতবার অগ্রসর হয়, সাতবারই হটিয়া আইসে। অবশেষে পীর্হস্ হস্তীর সাহায্যে রোমকদিগের ব্যূহ ভেদ করেন। পীর্হস্ স্বয়ং কহিয়াছিলেন যে, যদি তিনি এইরূপ আর একবার জয়ী হন, তাহা হইলে একটিমাত্র সৈন্য লইয়াও স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে পারিবেন না। খ্রীঃ পূঃ ২৭৯ অব্দের বসন্তকালে রোমকদিগের সহিত পীর্হসের আবার যুদ্ধ হয়। পীরহস এবারেও জয়ী হন, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও তাঁহার বহু সৈন্য নষ্ট হয়। পীরহস্ যুদ্ধে আহত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী শীতকালে তিনি তারেন্তামে প্রত্যাবৃত্ত হন। এই সময়ে সিসিলি দ্বীপের গ্রীকেরা কার্থেজবাসীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য পীরহসের সাহায্য প্রার্থনা করে। পীরহস্ এজন্য ২৭৮ অব্দের জাহাজে আরোহণ করিয়া, সিসিলিতে উপনীত হন। এস্থানেও তাঁহার জয়লাভ হয়। ২৭৬ অব্দে কার্থেজ তাঁহার নিকট অবনত হইয়া পড়ে। তারেন্তামেও তাঁহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ জয় লাভে গর্ব্বিত হইয়া পীরহস্ বিশ্ববিজয়ের কল্পনা করিতে থাকেন। কিন্তু ইহার মধ্যে কার্থেজবাসীরা বহুসংখ্য সমরকুশল সৈন্য লইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হয়। কার্থেজবাসীদিগের সহিত সমুদ্র যুদ্ধে পীরহসের অধিকাংশ সমরপোত বিনষ্ট হইয়া যায়। পীরহস্ যে ২০,০০০ পদাতি ও ৩,০০০ অশ্বারোহী তারেন্তামে আনিয়াছিলেন, এইরূপে তাহাদের বলদর্প অন্তর্হিত হয়। এই সময়ে তারেন্তামের অধিবাসীরাও পূর্ব্বের ন্যায় আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত পীরহস্কে অভিনন্দন করে নাই। পীরহস্ যুদ্ধে জয়ী হইলেও, বহুসৈন্য নষ্ট হওয়াতে শেষে সেই যুদ্ধজয় তাঁহার পক্ষে যেরূপ নিরাশজনক হইয়াছিল, ভারতসম্রাজ্যের ব্যয়বাদে উদ্বৃত্তের কথা শুনা গেলেও শেষে ব্যয়বাহুল্য প্রযুক্ত উদ্বৃত্তের কথায় সেইরূপ হতাশ হইতে হয়।—অনুবাদক।

মান হয়। আমাদের রাজস্ব-সচিবেরা অপব্যয়ী লোকের মত কতকগুলি অনাবশ্যক ব্যয়েরও একান্ত আবশ্যকতা দেখাইয়া আয় অপেক্ষা ব্যয়াধিক্যের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এইজন্য কখন দুর্ভিক্ষ, কখন অহিফেন, কখন এক্‌শ্চেঞ্জবৃদ্ধি, কখন সৈনিক নিবাস নির্ম্মাণের ব্যয়বৃদ্ধি, কখন বা যুদ্ধ, ঐ অনাটনের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ১৮৮০ অব্দে স্যার আস্‌লি ইডেন্ বলিয়াছিলেন, "যদি আফগানযুদ্ধে জলের ন্যায় অর্থ ব্যয় না হইত, তাহা হইলে ভারতে বেশ অর্থসচ্ছলতা থাকিত। ইহা দেখিয়া আমি স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি যে, পূর্ত্তকার্য্য বন্ধরাখার জন্য ইঙ্গলণ্ডে যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সাতিশয় অনিষ্টকর ও অদূরদর্শিতার পরিচায়ক"। ইডেন সাহেবের এই কথায় বোধ হয় যে, পররাষ্ট্র বিভাগের নীতির গুণে যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে, তাহা যেন দেশের হিসাবপত্র হইতে উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে এবং যেন পূর্ত্ত-বিভাগের কার্য্য অতিব্যয়ের প্রধান কারণ নহে। প্রধানতঃ এই কারণে গত ২৫ বৎসরে ভারতের ঋণ ৯০ কোটী হইতে ১৬২ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা হইয়াছে। যদি গবার্ণ্টির টাকা ও অন্যান্য বিষয় উহার মধ্যে ধরা হয়, তাহাহইলে উহা ২৪২ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা হইবে। ইহা সকলেই জানেন যে, কোম্পানির কাগজের দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র ভারতবাসীদের হাতে আছে, আর নয় ভাগ সমস্তই ইঙ্গলণ্ডবাসীদের *। ভারতের করদাতাদিগকে প্রতি

* ইণ্ডিয়া আফিসে আমাকে দেখান হয় যে, ভারতবর্ষীয়দিগের ২৪,৬২,১০,০০০ টাকার কোম্পানির কাগজ আছে। এই সংখ্যা ঠিক কি না, তদ্বিষয়ে বড় সন্দেহ আছে। আমার বিশ্বাস যে, উহার অধিকাংশই গবর্ণ-

বৎসর, উপরোক্ত ঋণের সুদ স্বরূপ ইঙ্গরেজ উত্তমর্ণকে টাকা দিতে হয়। "হোম চার্জ" বলিয়া ভারতবর্ষ হইতে যে ১৭ কোটী টাকা লওয়া হইয়া থাকে, ঐ ঋণের টাকাই তাহার একটা প্রধান খরচ। কেবল এই কারণেই ভারতবর্ষকে এক্স্চেঞ্জের দুর্ব্বিষহ ব্যয়ভার বহন করিতে হয়। ভারতবর্ষ অতি দরিদ্র, রেলওয়ে-বিস্তার ও খালখনন প্রভৃতি কার্য্যে ব্যয়ভার বহন করিতে অসমর্থ। ভারতবর্ষকে বাধ্য হইয়া ইঙ্গলণ্ড হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে হয়, এইরূপে ভারতের ঋণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে সুদের হারও বাড়িয়া উঠিতেছে। ভারতের রাজস্বের বহু ব্যয় দেখিয়া গ্লাডষ্টোন সাহেব এই কথা লিখিয়াছিলেন যে, "ভারতের আর্থিক অবস্থা উজ্জ্বলতর না হইয়া ঘোরতর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে; যাহারা অতীত ও ভবিষ্যতের বিষয় ভাবেন, তাঁহারা এ বিষয়ে স্যার্ রবর্ট পিলের এই উক্তি স্মরণ করিবেন যে, ইঙ্গলণ্ডের রাজস্বের সহিত ভারতের রাজস্বের সচ্ছলতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।" ভারতের পূর্ত্তকার্য্যে যেরূপ ব্যয় হয়, তাহাতে সুদ পোষান দূরে থাকুক, অনেক স্থলে কাজ চালাইবার ব্যয়ও নির্ব্বাহ হয় না। এইরূপ ব্যয়সাধ্য পূর্ত্তকার্য্যই ভারতের অসচ্ছলতা-বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ। যদিও কোন কোন স্থলে বিশেষ দক্ষিণাপথে খাল খননাদি দ্বারা অনেক ফললাভ হইয়াছে, তথাপি এরূপ অনেক স্থলে খালপ্রভৃতি প্রস্তুত হইয়াছে

ষ্টেটের অধীনস্থ কোর্ট অব্ ওয়ার্ড যে টাকা খাটান, এবং ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারিগণ আপনাদের সদাচরণের প্রতিভূস্বরূপ যে টাকা গচ্ছিত রাখেন, সেই টাকা।

যে, সেখানে উহার কোন প্রকার প্রয়োজন বা উপযোগিতা ছিল না। ঐ সকল খাল ইত্যাদি দ্বারা যে সকল প্রদেশের উপকার বা সুবিধা কিছুই হয় না, খালপ্রভৃতি প্রস্তুত করার জন্য যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে, তাহার সুদ দিবার নিমিত্ত সেই সকল প্রদেশের অধিবাসীদিগকে দুর্ব্বহ করভার বহন করিতে হয়। যাহাদের ভূমি ঐ সকল খালের জলে সিক্ত হইয়াছে, উহা তাহাদের পক্ষে একটি অত্যাচারের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। দুর্ভিক্ষের সময়ে রেলওয়ের দ্বারা যেরূপ সুবিধা হইয়া থাকে, তাহাতেই ভারতে রেলওয়ে বিস্তার করা অনেক পরিমাণে ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু কেবল আর্থিক অবস্থার বিষয় ধরিলে উহা এরূপ ব্যয়সাধ্য যে, এদেশে উহা লাভের বিষয় হইতে পারে না। অধিকতর উর্ব্বর ও সম্পত্তিশালী ভূখণ্ডের মধ্য দিয়া যে সকল পুরাতন লাইন গিয়াছে এবং যাহাদ্বারা বহুজনপূর্ণ বাণিজ্যপ্রধান নগরের সহিত সমুদ্রের উপকূলের সংযোগ হইয়াছে, তাহাতেও কখন কখন সামান্য লাভ হয়। দুর্ভিক্ষ বা যুদ্ধের সময়েই কেবল ঐ সকল রেলওয়ের অনেক লাভ হইয়া থাকে। রেলওয়ে দ্বারা কোন কোন স্থানের জলনির্গমের পথরোধ হওয়াতে অধিবাসীদিগের স্বাস্থ্যহানি হইয়াছে। যে সকল নূতন লাইন প্রস্তুত হইতেছে, বা প্রস্তুত হইবার কথা হইতেছে, স্থানীয় কর্ম্মচারীরাই সেই সকল অভিনব লাইন প্রস্তুত করার পক্ষে মত দিয়া থাকেন, যেহেতু রেলওয়ে বিস্তার হইলে তাহাদের নির্জ্জনপ্রবাস দূর হয়। ইঞ্জিনিয়ারগণও রেলওয়েবিস্তারে অনুমোদন করেন, যেহেতু উহাতে তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত হয়। যে সকল লোক অনেক লাভ হইবে ভাবিয়া রেলওয়েলাইন প্রস্তুত করেন,

তাঁহারা প্রবঞ্চিত হন। কারণ গবর্ণমেণ্ট প্রতিভূ না হইলে এবং অন্যান্য অধিকার না পাইলে তাঁহারা এই কাজে টাকা খাটান না। এইরূপ পরীক্ষাসহ কার্য্যে নিশ্চয়ই ফললাভ হইবে, তাঁহাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতিরেকে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। এইরূপেই এই সকল স্থানে লাভালাভের পরীক্ষা করিয়া লওয়া যায়। রেলওয়ে দ্বারা দেশের সম্পত্তির পূর্ণ বিকাশ হইবে, ইহা রেলওয়েনির্ম্মাণের যথোপযুক্ত কারণ নহে; এসকল বিষয় অপরাপর লোকের হস্তে সমর্পণ করা ভাল। এসকল বিষয়ে টাকা লাগাইবার যাঁহাদের ইচ্ছা আছে, তাঁহাদের যদি ভবিষ্যতে ফললাভ হইবে, এরূপ বিশ্বাস জন্মে, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বভারও তাঁহাদের গ্রহণ করা উচিত। দুর্ভিক্ষ নিবারণ জন্য যাহা আবশ্যক, তাহা ব্যতীত অন্যান্য স্থানে রেলওয়ে বিস্তার করা গবর্ণমেণ্টের উচিত নহে।

অন্যান্য ব্যয়ের সম্বন্ধে অপরাপর লোকে যাহা কহিয়াছেন তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। যে অতিরিক্ত সৈনিক ব্যয় এক্ষণে প্রায় ২০০ কোটী টাকা হইয়াছে এবং যাহা 'একদেশ * ব্যতীত সমগ্র পৃথিবীতে ব্যয়বাহুল্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে,' তাহার সম্বন্ধে কোন কথা বলার প্রয়োজন নাই। দেওয়ানী বিভাগে যে উত্তরোত্তর ব্যয়বৃদ্ধি হইতেছে, আমি তৎপ্রসঙ্গেও কোন কথা বলার প্রয়োজন দেখি না। ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, শাসনসংক্রান্ত সকল বিভাগেই ব্যয়বৃদ্ধি হইতেছে।

এই অনর্থক ব্যয় সংকুলানের জন্য নূতন নূতন কর প্রবর্ত্তিত

* সম্ভবতঃ জর্ম্মণসাম্রাজ্য।—অনুবাদক।

হইতেছে। ঐ কর দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয়। প্রজারা উহার ভার বহন করিতে সমর্থ নয়। সিপাহিযুদ্ধের পর হইতে আমরা কেবল নূতন নূতন কর আবিষ্কার করিতেছি। এখন দেশ শান্তির জন্য লালায়িত হইয়াছে, কিন্তু আমরা রাজস্বঘটিত অশান্তি অব্যাহত রাখিতে জিদ করিতেছি। ইহার সমান্তরাল ঘটনা অন্য কোন দেশে সম্ভবে না। "কলিকাতা রিবিউ" নামক সাময়িক পত্রে একজন লেখক সম্প্রতি লিখিয়াছেন, "১০ বৎসরের মধ্যে ৬ প্রকার ষ্টাম্প আইন হইয়াছে। প্রথমটিতে যাহা কিছু অসম্পূর্ণতা ছিল, দ্বিতীয়টি তাহা সারিয়া সুরিয়া লইয়াছে, তৃতীয়টি, প্রথম ও দ্বিতীয়টি উভয়কেই রদ করিয়াছে, চতুর্থটি দ্বারা তৃতীয়ের অর্দ্ধাংশ, পঞ্চমটি দ্বারা তৃতীয়ের অপর অর্দ্ধাংশ রদ করা হইয়াছে, আবার ষষ্ঠটি, চতুর্থটিকে বাতিল করিয়া ফেলিয়াছে। ৫০ বৎসর ধরিয়া যে প্রাচীন আইন অনুসারে কার্য্য হইতেছিল, তাহার বিষয় না জানিয়া শুনিয়া এইরূপে ৬টি আইন করা হইয়াছে। আয়করের নির্দ্ধারণপ্রণালী ৭বার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, প্রতিপরিবর্ত্তনে আয়নির্দ্ধারণপ্রসঙ্গে লোকদিগকে নূতন নূতন গোলযোগে ফেলা হইয়াছে। করস্থাপনে অসংখ্য সুবিধার জন্যই মিউনিসিপাল আইন প্রস্তুত করা হইয়াছে। ঠিক হউক, বা নাই হউক, অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে, স্থানীয় কর স্থাপন করিয়া গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালার একটি সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিয়াছেন। ভূমির পুনর্বন্দোবস্ত, জরীপ ও অবিরত খাজানা বৃদ্ধি, ভূমির খাজানা অল্পহারে হইয়াছে বলিয়া পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান করা, সরাসরির প্রণালীতে গবর্ণমেণ্টের দাবী

আদায় করা, বিক্রয়ের কাঠিন্য, ওয়ারেণ্ট এবং সার্টিফিকেট, এই সকল বিষয় এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কঠোরতা ও অধিকতর দৃঢ়তার সহিত সম্পন্ন হইতেছে। প্রজারা উদরান্নের জন্য লালায়িত হইয়াছে আমরা তাঁহাদের পরিতৃপ্তির জন্য নূতন নূতন আইন রাশীকৃত করিয়া দিতেছি। ব্যবস্থাগ্রন্থ সকল দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের এই ব্যবস্থাগ্রন্থ বিস্ময়ের বিষয় না হইয়া সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। এখন আমাদের অভিপ্রায়ের সাধুতা প্রতিপন্ন করা বৃথা। প্রজারা কুফল দেখিয়া আমাদের অভিপ্রায় অসৎ ভাবিতেছে। "অনেক বৎসর ধরিয়া নিরন্তর করভার বৃদ্ধি হওয়াতে ইউরোপীয় ও ভারতবর্ষীয়, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষের সঞ্চার হইয়াছে; আমার বিশ্বাস যে, এই ভাব স্থায়ী হইলে রাজ্যের বড় বিপদ ঘটিবে। ঐ অসন্তোষের প্রবলতা অতিরঞ্জিত নহে।" লাগ্‌দনাম নগরে সম্রাট ক্লদিয়সের বক্তৃতার* ন্যায় লর্ড মেওর এই বাক্য পিত্তলের ফলকে খোদিত করিয়া কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও সিমলার ব্যবস্থাপক সভার গৃহে রাখা উচিত। সভ্য গবর্ণমেণ্টের উপর যে, কিয়ৎ পরিমাণে বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত, তাহা বলায় কোন ফল নাই। একজন প্রসিদ্ধ লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের মতে, গবর্ণমেণ্ট নিন্দার্হ নহেন ববং উহা "পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ গবর্ণমেণ্ট।"

* রোমের সম্রাট্ ক্লদিয়স্ গল দেশের অধিবাসীদিগকে সেনেট মন্ত্রসভার প্রবেশাধিকার দেওয়ার সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই বক্তৃতা ব্রোন্‌জ ধাতুর ফলকে খোদিত হইয়া লাগ্‌দনাম (ফ্রান্সের অন্তঃপাতী বর্ত্তমান লায়ন্স নগর) নগরে ছিল। ১৫২৮ অব্দে ঐ ফলক লায়ন্স নগরে পাওয়া যায়।—অনুবাদক।

একথাও এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক। প্রকৃত কথা এই যে, আমাদের উপর প্রজাসাধারণের অবিশ্বাস জন্মিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট আপনাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেন বলিয়া ভারতবাসীরা গবর্ণমেণ্টের উপর দোষার্পণ করিতে সঙ্কুচিত হয় না। করদাতারা "ইহার পর আর কি দিতে হইবে? কেন দিব? কোথা হইতে দিব?" এই সকল প্রশ্ন যে জিজ্ঞাসা করে, তাহা অসঙ্গত নহে। এই সকল প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর না পাইলে তাহারা যে করসংগ্রাহক-দিগের উপর সন্দিহান হইয়া থাকে, তাহা কি বিচিত্র?

ভারত গবর্ণমেণ্ট এখন নিত্য নূতন কর আবিষ্কার করিবার জন্য মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতেছেন। তাঁহাদের সমস্ত আয় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা সামান্য অপব্যয়ী লোকের ন্যায় ঋণ করিয়া আপাততঃ আয়ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে-ছেন। ভারতের আর্থিক অবস্থা এতই অনিশ্চিত যে, রাজস্ব-সচিবকেও স্বীকার করিতে হইয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কত আয় হওয়া প্রয়োজন, তাহা তিনি ঠিক করিতে পারেন না। এখন কর বৃদ্ধি করা অসম্ভব, ব্যয়সংক্ষেপ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। গবর্ণমেণ্টের সমস্ত রাজস্বনীতি এখন কেবল "ব্যয়সংক্ষেপ" এই কথাটির মধ্যেই নিহিত রাখা উচিত হইতেছে। প্রতি বৎসর আয়ব্যয়ের হিসাবের সঙ্গে ব্যয়সংক্ষেপের বিজ্ঞাপন বাহির করা হয়, কিন্তু উহার প্রতি এরূপ ঔদাসীন্য দেখান হয় যে, প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যয়সংক্ষেপ হয় না। এ পর্য্যন্ত সিমলাস্থিত গবর্ণমেণ্টের নিকট ব্যয়সংক্ষেপের যে সকল প্রস্তাব হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা অধিকতর সম্পূর্ণ ও অধিকতর মৌলিক প্রস্তাব আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। কতিপয় সামান্য কর্ম্মচারীর

পদ কমাইলে বা উঠাইয়া দিলে কিংবা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয়ে সস্তাদবে অপকৃষ্ট কাগজকলম প্রভৃতি যোগাইলে, অথবা সমস্ত অনাবশ্যক পূর্ত্ত কার্য্য বন্ধ বাখিলে বা যে নিম্নতব বিচারবিভাগে পূর্ব্বে সিবিল কর্ম্মচাবীদিগেব পুত্র ও ভ্রাতষ্পুত্রেবা নিয়োজিত হইতেন, সেই বিভাগে কতিপয় ভাবতবাসীকে নিযুক্ত কবিলে উপস্থিত সঙ্কট দূব হইবে না। *আমাদের সমস্ত নীতিব আমূল* পবিবর্ত্তন কবা উচিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় কমাইতে হইবে, আত্মীয়-স্বজনপ্রীতি ও ন্যাযবর্হিভূত কার্য্য উঠাইযা দিতে হইবে, কেবল এরূপ কবিলে চলিবে না। গবর্ণমেণ্টেব সমস্ত কার্য্যই অভিনব প্রণালীতে অল্পব্যযে নির্ব্বাহ কবিবাব বন্দোবস্ত কবিতে হইবে। ইঙ্গবেজ কর্ম্মচাবী বাখিতে অনেক ব্যয হয, তাঁহাদেব বেতন অত্যন্ত অধিক। তাঁহাবা ইউবোপীয় সভ্যতাব যে সুফল এদেশে প্রবেশিত কবিতেছেন, এদেশেব অধিবাসীদিগেব এমন অর্থ-সংগতি নাই যে, তাহা ভোগ কবে। ইঙ্গলণ্ডেব কৃষকেবা যেমন ঘোড়দৌড়েব ঘোড়াব দ্বাবা অথবা ভাবতেব বাযতেবা যেমন হাতীব দ্বাবা চাষ কবিতে অক্ষম, সেইরূপ ভাবতবর্ষও বিদেশীয়-কর্ত্তৃক শাসিত হওযাব এবং সুবিস্তৃত বেলওযে, বৃহৎ বৃহৎ সৈনিক নিবাস ও অন্যান্য বাজকীয় কার্য্যালয়েব প্রাসাদ নির্ম্মা-নের ব্যযভাব বহনে অসমর্থ। ইউবোপীযদিগেব পবিবর্ত্তে ভাব-তেব অধিবাসীদ্বাবা ভাবতেব শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ কবাই ব্যযসংক্ষেপের একমাত্র উপায। যদি গবর্ণমেণ্ট প্রকৃত পক্ষে মিতব্যযিতাব দিকে দৃষ্টি রাখেন, তাহা হইলে এদেশের অভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্যেব ভাব এতদ্দেশীয়দিগেব হস্তে অধিক পবিমাণে দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

শাসনকার্য্যের সংস্কার।

ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদিগের পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষীয়দিগকে ক্রমে ক্রমে নিযুক্ত করা অভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্যসংস্কারের মূল সূত্র। ভারতের শিক্ষিত অধিবাসিগণ এখন এই দিকেই আপনাদের সমস্ত চেষ্টা বিনিযোগ করিয়াছেন। তাঁহাদের ন্যায়-সঙ্গত আশা কিয়ৎ পরিমাণে পূরণ করিতে গেলে তাঁহাদের এই প্রার্থনা পূর্ণ করা উচিত। ইহাই এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কার্য্য হইয়া উঠিয়াছে।

খরচপত্র কম হয়, এজন্য ঐকার্য্য আবশ্যক। খরচ কম হওয়া ব্যতীত অন্যান্য গুরুতর কারণেও উহা আবশ্যক। আমি আমার স্বদেশীয়গণের রাজ্যশাসনক্ষমতার নিন্দা করি না। লর্ড লীটন যেমন বলিয়াছেন, আমিও সেইরূপ বলিতে পারি, "আমি নিজের দূরদর্শিতাবলে যাহা জানিয়াছি এবং নিজের চক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি যে, পৃথিবীর অন্য কোন সম্প্রদায় কোন কালে, কোন সমাজে ইহা অপেক্ষা অধিকতর উপকার করে নাই।" আমি অনেক দেখিয়াছি, আমার পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মচারী ও সহযোগীবর্গের কার্য্যের সংস্রবে সতত আসিয়াছি, তাহাতে আমি বলিতে পারি যে, তরুণবয়স্ক ইঙ্গরেজ মাজিষ্ট্রেটদিগের একাগ্রতা, সাধুতা অকপটতা এবং কার্য্য করিবার জন্য উৎসাহ ও ব্যগ্রতার সম্বন্ধে কেহই সন্দিহান হইতে পারে না। ভারতবর্ষীয়দিগের যতই বুদ্ধিবল বা সৎশিক্ষা থাকুক না কেন, তাঁহারা যে, ইঙ্গরেজ রাজকর্ম্মচারী-

দিগের ন্যায় আপনাদের দেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন, তাহা আমার বোধ হয় না; এবিষয়ে কেহ অন্যরূপ না বুঝেন, তাহাই বাঞ্ছনীয়। আমি যতদূর জানি, তাহাতে ভারতবর্ষীয়েরা ইঙ্গরেজের সমকক্ষ হওয়ার দাবী করেন না। বিদেশের গবর্ণমেণ্ট—বিদেশীয় শাসনপ্রণালীতে ইঙ্গরেজ রাজপুরুষেরা এরূপ অসুবিধা ভোগ করেন যে, তাঁহারা ভালরূপে কার্য্য করিলেও তদ্দ্বারা ক্ষতির পূরণ হয় না। সিবিল কর্ম্মচারীরা যখন অতি তরুণবয়স্ক, দেশের ভাষায় অনভিজ্ঞ থাকেন, তখনই তাঁহাদের হস্তে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা সমর্পিত হয়; ঐ ক্ষমতা এত অধিক যে, উহার সহিত পৃথিবীর অন্য কোন সভ্য গবর্ণমেণ্টের ঐরূপ কর্ম্মচারীদিগের ক্ষমতার তুলনা হয় না। সাধারণ মতে পরিচালিত না হওয়াতে এবং সাধারণ রাজকার্য্যে অদূরদর্শী থাকাতে তাঁহারা অনুচিত কাঠিন্যের পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহাদের দোষ অনেক স্থলে যৌবনসুলভ দোষ। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ব্যতীত কেবল ভারতবর্ষেই কেন অপরিণত-বয়স্ক ব্যক্তিগণ বিচার ও শাসন-বিভাগের গুরুতর কার্য্য করিবেন, তাহার কারণ দেখা যায় না। এ বিষয় বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, পরিণতবয়স্ক অভিজ্ঞ ভারতবাসীদিগকে ঐ সকল পদে নিয়োগ করিলে ভাল হয় *। পরিণত-

* এখন অতি অল্পবয়স্ক ভারতবর্ষীয়দিগের হস্তে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হয়, ইহা আমাদের বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীর একটি গুরুতর দোষ। ভারতবর্ষের জলবায়ুর বিষয় বিবেচনা করিয়া তরুণবয়স্ক ইঙ্গরেজদিগকে এদেশে পাঠান আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষীয়দিগকে কেন ২১ বা ২২ বৎসরে মাজিষ্ট্রেট করা হয়, তাহার কোন কারণ নাই, তথাপি সচরাচর এরূপই করা হইয়া থাকে। ২৫ বৎসরের অধিক বয়স হইলে কোন ভারত-

বয়স্ক ভারতবাসীরা অপরিণত-বয়স্ক ইউরোপীয়গণ অপেক্ষা অল্প বেতনে কার্য্য করিতে পারেন। তাঁহাদের দেশের ভাষা ও আচারব্যবহারে অভিজ্ঞতা থাকাহেতু অন্যান্য বিষয়ে বিস্তর সুবিধা আছে। ভারতবাসীদিগকে আপনাদের শরীর বলাধান করিবার জন্য দীর্ঘ কালের অবকাশ লইয়া ইউরোপে যাইতে হয় না। ইঙ্গরেজ রাজপুরুষেরা সম্পূর্ণ বিপরীত ও বিদেশীয় স্বার্থ ও রীতিনীতি লইয়া সর্ব্বদা জ্বালাতন হন, ভারতবাসীদিগকে সেরূপ হইতে হয় না। ভারতবাসীরা জনসাধারণের প্রকৃতি ও ব্যবহার ভালরূপে জানেন। ইউরোপীয় রাজকর্ম্মচারীদিগের যতই গুণ থাকুক না কেন, উহা এই সকল সুবিধা অপেক্ষা কখনও অধিক হইবে না *। ভারতবর্ষীয়েরা যে, তাহাদের স্বদেশীয়-বাসী ডেপুটী বা সহকারী মাজিষ্ট্রেট হইতে পারিবে না, এরূপ একটি নিয়ম আছে। ভারতগবর্ণমেণ্ট এ অংশে সিবিলসর্ব্বিসের দৃষ্টান্তে অন্ধ হইয়া থাকেন। ঐ সরবিস যে, বিদেশীয় লোক ঘটিত এবং যখন বিদেশী লোকের সহিত উহার সংস্রব না থাকে, তখন উহার দোষ অনুসরণ না করিয়া সংস্করণ করা যে, উচিত, গবর্ণমেণ্ট তাহা ভুলিয়া যান।

* "যে শাসনপ্রণালীতে রাজকর্ম্মচারীদিগকে অপরিণতবয়সে গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়, তাহা তপেক্ষা মন্দ শাসনপ্রণালী আর নাই। দীর্ঘকাল ধরিয়া কার্য্য করাহেতু যখন ঐ সকল কর্ম্মচারী বিচক্ষণ ও আপনাদের কার্য্যে উপযুক্ত হন, তখন তাহাদিগকে সরাইয়া অন্য নূতন লোক তাঁহাদের স্থলে নিযুক্ত করা হয়। এই নব নিয়োজিত নবীন কর্ম্মচারী পূর্ব্ব প্রক্রিয়ানুসারে নানা ভ্রমপ্রমাদের পর যখন অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেন, তখন তাঁহাকে আবার কোন অপরিজ্ঞাত, অদৃষ্টপূর্ব্ব কার্য্যক্ষেত্রে আনিয়া ফেলা হয়। যাহাদের অর্থে তাঁহারা জ্ঞান লাভ করেন, তাহাদের কোন উপকারে আইসেন না। রাজকর্ম্মচারীদিগের পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন ও তাঁহাদের অল্প বয়স লইয়া গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অনেক আন্দোলন হইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষে বাস করিতে আমাদের সামর্থ্য নাই, ভারতের একজন দূরদর্শী ও আমাদের সুহৃৎ, রাজনীতিজ্ঞের মতে ইহাই আমাদের শাসনকার্য্যের বিরুদ্ধে অনুল্লঙ্ঘনীয় আপত্তি।

দিগের বিচারকার্য্যে অধিকতর পারদর্শী, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। দ্বারকানাথ মিত্রের প্রগাঢ় বিদ্যাবুদ্ধি ও উদার নীতি প্রমাণ করিয়া দিতেছে যে, ভারতবর্ষীয়েরা বিচারপতির অতি গুরুতর কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ। দ্বারকানাথ মিত্র অনেক বৎসর বাঙ্গালার হাইকোর্টে বিচারাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে ও পরবর্ত্তী শিক্ষিত ভারতবাসী ঐরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া দক্ষতার সহিত উহা সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের নামও উল্লেখ করা যাইতে পারে। নিম্নতন বিচারবিভাগের কার্য্যে কেবল ভারতবর্ষীয়গণই নিযোজিত রহিয়াছেন। তাঁহারা যে সততা ও দক্ষতার সহিত আপনাদের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়, ভূতপূর্ব্ব লর্ড চান্সেলর সেলবোর্ণ অপেক্ষা কেহই এসম্বন্ধে যোগ্যতর বিচারক নহেন। লর্ড সেলবোর্ণ একদা পার্লিয়ামেণ্টে বলিয়াছিলেন*ঃ—

"আমি অনেক বৎসর ধরিয়া প্রিবিকৌন্সিলে ভারতবর্ষের মোকদ্দমায় কৌন্সলির কার্য্য করিয়াছি। ঐ সময়ে যে সকল

"স্যার সলার জঙ্গের মতে আমাদের বিরুদ্ধে এই একটি অপবাদ আছে—'এ দেশ আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী অধিপতিগণের একবারে বিদেশ স্বরূপ ছিল না। তাঁহারা এদেশে বাস করিতেন এবং এদেশের প্রজাদের সহিত মিশিতেন। এজন্য ততটা দোষ লক্ষিত হইত না। আমাদের অনেক গুণ থাকাতেও আমরা ঐরূপ করিতে পারি না। আমাদের শাসন প্রণালীর বিরুদ্ধে যত আপত্তি আছে স্যার সলার জঙ্গ, ইহাই প্রধান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।' (East Indian systems of Government, p. 73)—ডাক্তর কন্গ্রিব সাহেবের ভারতবর্ষ নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত। ঐ পুস্তক ১৮৫৭ অব্দে প্রকাশিত ও ১৮৭২ অব্দে পুনর্মুদ্রিত হয়।

* ১৮৮৩ অব্দের ১০ই এপ্রেলের টাইম্‌স্ নামক সংবাদপত্রে এই বক্তৃতা যে ভাবে প্রকাশিত হয়, মূলগ্রন্থে তদনুরূপ মুদ্রিত হইয়াছে।

গুরুতর মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে তৎসমুদায়ের সহিত আমার সংস্রব ছিল। ভারতবর্ষীয় বিচারকেরা কিরূপে দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার করেন, তাহা জানিবার আমার বিস্তর সুবিধা ঘটিয়াছিল। আমি অসঙ্কুচিতচিত্তে বলিতেছি যে, তুলনায় সমালোচনা করিলে ভারতবর্ষীয় বিচারকদিগের রায় সকল ইঙ্গরেজ বিচারকদিগের রায় অপেক্ষা অনেক ভাল। আমি জানি প্রিবিকৌন্সিলের বিচারপতিরাও তৎকালে ঐ মতাবলম্বী ছিলেন। ইঙ্গরেজ বিচারকেরা বিশেষ সাবধানে আপনাদের কর্ত্তব্য কার্য্যের সমাধান করিয়া থাকেন। ইঁহাদের বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিলে আমার ক্ষোভ জন্মিবে, তথাপি আমি পুনর্ব্বার অসঙ্কুচিত চিত্তে বলিতেছি যে, সাধুতায়, অভিজ্ঞতায়, জ্ঞানগরিমায়, বিচারবুদ্ধির গভীরতায় ও উভয় পক্ষের সন্তোষজনক সিদ্ধান্তের গুণে, ভারতবর্ষীয়েরা ইঙ্গরেজ বিচারকদিগের সমকক্ষ।”

কি উচ্চ, কি নিম্ন, সকল বিভাগেই ভারতবর্ষীয় বিচারকেরা যে, দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতেছেন, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। আমি যে মতের সমর্থন করিতেছি, তাহা পূর্ব্বেই অনুমোদিত হইয়াছে। তথাপি যদি ভারতবর্ষীয়দিগকে মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর অথবা সিবিল জজের পদে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব হয়, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইবে। যখন ভারতবর্ষীয়দিগকে জজিয়তি দেওয়ার প্রস্তাব হয়, তখন ঐ প্রস্তাবের মূলে বোধ হয় এই নিগূঢ় ভাব ছিল যে, বিচারকের কার্য্যে কেবল মানসিক গুণেরই পরিচয় দিতে হয়; ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে ঐ গুণের বিকাশ দেখা যায়। পক্ষান্তরে মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে মানসিক গুণ ব্যতীত

একাগ্রতা, ক্ষিপ্রকাবিতা, স্থিব বুদ্ধি, আত্মনির্ভব, সংযোজন ও সংগঠনশক্তি, লোকদিগকে চালাইবাব ক্ষমতা প্রভৃতি আব-শ্যক কবে। ভাবতবর্ষীযদিগেব মধ্যে এখনও ঐ সকল গুণেব পূর্ণ বিকাশ হয নাই, এজন্যই বোধ হয ভাবতবর্ষীযদিগকে এই সকল কার্য্যে নিযুক্ত না কবিযা কেবল ইঙ্গবেজদিগকে নিযুক্ত কবা হইযা থাকে। যাঁহাবা বর্ত্তমান প্রণালীব সংস্কাবেব বিবোধী, তাঁহাবা এইরূপ যুক্তি দেখাইযা থাকেন। তাঁহাবা মনে কবেন, ভাবতবর্ষীযেবা কোন জেলাব শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ কবিতে অযোগ্য। সকল ইঙ্গবেজই বিপদেব সময শান্তভাব ও দূবদর্শিতাব পবিচয দিযা থাকেন। পক্ষান্তবে কোন ভাবতবর্ষীয এইরূপ গুণেব পবিচয দিতে পাবেন না। সুতবাং কেবল ইঙ্গবেজেব হস্তেই এই সকল গুরুতব ভাব সমর্পণ কবা উচিত, এইরূপ মনে কবা তাঁহাদেব পক্ষে সুবিধাজনক, অযথোচিত আত্মগবিমায আমাদেব বিশ্বাস জন্মিযাছে যে, ভাবতবর্ষীযেবা কেবল আমলাগিবি কবিতে সমর্থ। তাহাবা কখন একটি জেলাব ভাব লইতে সক্ষম নয। যদি কোন জেলাব কায্য কবিতে হয, তাহা হইলে তাহাদিগকে ইঙ্গবেজ কর্ম্মচাবীব তত্ত্বাবধানে বাখা ভাল। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, ভাবতবর্ষীযেবাই আমাদেব বাজ্য-শাসনপ্রণালীব মেরুদণ্ড স্বরূপ। ভাবতবর্ষীয অধীনস্থ কর্ম্মচাবীদিগেব হস্তেই সকল কার্য্যের ভাব থাকে। গুরুতব কার্য্যেব ভাব সর্ব্বদা তাহাদিগকেই বহন কবিতে হয এবং যখন কোন অকর্ম্মণ্য ইউবোপীযেব হস্তে (যেমন সচবাচব হইযা থাকে) কোন জেলাব ভাব থাকে, তখন তাহাব অধীনস্থ ডেপুটী ও কেবাণীদিগকে সমস্ত কার্য্যই কবিতে হয।

যদিও কিয়ৎ কালের জন্য শাসনকার্য্যের কিছু ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও ভারতবর্ষীয়দিগকে শাসন-বিভাগে নিযুক্ত করিয়া উৎসাহ দেওয়া উচিত। লর্ড রিপন তাঁহার আত্মশাসন-প্রণালীর সমর্থন স্থলে যথার্থই বলিয়াছেন যে, এই প্রণালী রাজনৈতিক শিক্ষার উপায়স্বরূপ হইবে *। বাস্তবিক যদি আমাদের পরিণামে একটি স্বাধীন গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে প্রকৃতিবর্গকে শাসনবিভাগের প্রত্যেক কার্য্যের সহিত পরিচিত করাইয়া আত্মাবলম্বন ও আত্মনির্ভরের ভাব উদ্দীপ্ত করা আমাদের উচিত।

এস্থলে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য অপেক্ষা জজের কার্য্য শ্রেষ্ঠ, এজন্য ভারতবর্ষীয়দিগকে জজিয়তি

* ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৮[illegible] অব্দের মে মাসে যে মন্তব্যলিপি প্রকাশ করেন, তাহার ৫ম প্যারায় লিখিত আছে— "আত্মশাসন প্রণালীর বিস্তার করিবার সমর্থনস্থলে এবং ঐ প্রণালী অনুসারে স্থানীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার বন্দোবস্তকালে তিনি (লর্ড রিপন) বলিয়াছেন যে, জেলার রাজকর্ম্মচারীদিগের হস্তে এই সকল কার্য্য ভার থাকিলে যেরূপ সম্পন্ন হইত, প্রথমে তাহা অপেক্ষা যে ভাল হইবে, ইহা তাঁহার বিশ্বাস নাই। শাসনপ্রণালীর উন্নতিসাধন জন্য এই প্রণালী উদ্ভাবিত বা অনুমোদিত হয় নাই। ইহা হইতে প্রকৃতিবর্গের রাজনৈতিক শিক্ষা হইবে, এই উদ্দেশ্যে এই প্রণালীর প্রবর্ত্তনা হয়। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণরজেনেরলের বিশ্বাস যে কোন বিশেষ স্থলের শাসনসম্বন্ধে সেই স্থানের লোকের যে পরিমাণে জ্ঞান ও মনোযোগ আছে, তাহা কার্য্যে প্রযোজিত হইলে তাহার উন্নতি হইবে। কিন্তু প্রথমে কার্য্য করিতে গেলে এত দোষ বা এত প্রমাদ ঘটিবে যে, ইহার কার্য্যকারিতার বিষয়ে হতাশ হইতে হইবে এবং কোন কোন স্থলে উহা দ্বারা আত্মশাসনপ্রণালীর মূলেও দোষ স্পর্শ হইবে।"

এই মন্তব্য অনেকে কেবল মানসিক উত্তেজনা ও অনুচিত অলঙ্কারপূর্ণ বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার বিবেচনায় ইহা গভীর রাজনীতিজ্ঞের উক্তি।

দিবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে নিযুক্ত করা আবশ্যক। প্রথমতঃ কিছুদিনের জন্য তত্ত্বাবধারণের ভার এবং ছানি ও আপিল প্রভৃতি আমাদের হস্তে যে রাখা উচিত, তাহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু তাহা বলিয়া যে, তাঁহাদের হস্তে শাসনকার্য্যের ভার দিব না, ইহা কখন যুক্তিসঙ্গত নহে। পক্ষান্তরে আমরা যে বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনের যুগ প্রবর্ত্তিত করিয়াছি, তাহাতে ভারতবর্ষীয়দিগকে শাসনবিভাগে নিযুক্ত করা বাঞ্ছনীয়। তাহারা যতদিন অপেক্ষাকৃত গুরুতর কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ না হয়, ততদিন তাহাদিগকে ঐরূপে শিক্ষা দেওয়া উচিত। যদি ভারতের কার্য্য হইতে ক্রমে অবসর লইতে আমাদের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয়দিগকে বিচারবিভাগে নিযোগ করা অপেক্ষা রীতিমত শাসনবিভাগে নিযোগ করাই ভাল। বিচারবিভাগে নিযোজিত হইলে তাহাদের হস্তেই আপিল ও পুনর্বিচারের ক্ষমতা থাকা উচিত।

কেবল বিষয়বুদ্ধিতে যদি গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করেন, তাহাহইলেও ভারতবর্ষীয়দিগকে শাসনবিভাগে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীতে এই ব্যতিক্রম দেখা যায় যে, শাসকসম্প্রদায়ের লোকেরা শাসন-বিভাগের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন; পক্ষান্তরে ভারতবর্ষীয়েরা বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া সেই সকল কার্য্যে দোষাদোষের মীমাংসা করিয়া থাকেন। ইহাতে অনেক সময়ে তাঁহাদিগকে ঐসকল কার্য্যের বিরুদ্ধ পক্ষ সমর্থন করিতে হয়। এজন্য উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া থাকে। যদিও এই প্রণালীতে ফল ভাল হয়, তথাপি ইহা ইঙ্গরেজ রাজকর্ম্মচারী ও ভারত-

বর্ষের সংবাদপত্রের মধ্যে বিরোধ ঘটাইবার যে, একটি কারণ, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ইউরোপীয়-দিগের স্থলে ভারতবর্ষীয়দিগকে শাসনকার্য্যে নিযুক্ত করা যে, কতদূর সঙ্গত, তাহা এতদ্দ্বারাই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ইহাতে ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্রসমূহকে ইউরোপীয়দিগের পরিবর্ত্তে তাহাদের স্বদেশীয়গণেরই কার্য্যের খুটিনাটি ধরিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়।

ভারতবর্ষীয়দিগকে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈনিক শ্রেণীতে গ্রহণ করা উচিত কিনা, তদ্বিষয়ে সম্প্রতি কলিকাতায় একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ পুস্তকে উপস্থিত বিষয়ের দোষ গুণ সুন্দররূপে বিচার করা হইয়াছে। এবিষয়ে গ্রন্থকারের সহিত আমার মতবিরোধ নাই। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন :—

"ভারতবর্ষীয়গণ রুচি, স্বার্থ, মানসিক গুণ ও উন্নতির ইচ্ছাতে অসংখ্য সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে, যখন এই সকল সম্প্রদায়ের লোকের হস্তে গুরুতর রাজকার্য্যের ভার সমর্পিত হয়, তখনই সাম্প্রদায়িক ভাব ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণমাত্রায় দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। রাজনৈতিক ভাবে দেখিলে ভবিষ্য-কালে ভারতের ইঙ্গরেজদিগকে এই সকল বিচ্ছিন্ন ও প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ের মধ্যবর্ত্তিতা গ্রহণ করিতে হইবে। ইঙ্গরেজেরা তাঁহাদের প্রকৃতিসিদ্ধ গুণে এই ভার গ্রহণের সম্পূর্ণ যোগ্য। যাঁহারা শাসনবিভাগে নিয়োজিত ভারতবর্ষীয়দিগের সংস্রবে আসিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিয়াছেন যে, শত শত সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দলের বিরোধস্থলে একজন ইঙ্গরেজের মত আগ্রহের সহিত গৃহীত হইয়াছে এবং তাঁহারা যে মত দিয়াছেন, সেই মতানুসারে

বিরোধীদিগকে কার্য্য করিতে হইয়াছে। যদি ভারতবাসীরা ক্রমে অধিক পরিমাণে স্বদেশের শাসনকার্য্যে নিয়োজিত হয়, তাহা হইলে যে তীব্র সমালোচনা এখন কেবল ইউরোপীয় সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া হইতেছে, তাহা ভারতবাসীরা আপনাদের পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া করিবে। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থে বিভক্ত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের উপর কঠোর সমালোচনা হইলে যদি উহা ভালভাবে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে সাধারণে আপনাদের সাধারণ দেশের উপর অনুরাগবিশিষ্ট হইয়া উঠিবে।

সুশিক্ষিত ভারতবাসীদিগকে দমনে রাখ, তাঁহাদের প্রতি অবিশ্বাস স্থাপন কর, তাঁহাদিগকে দেখিতে দাও যে,—ভারতবর্ষ ভারতবাসীদিগের জন্য, ভারতবাসীকে রাজ্যশাসনকার্য্যে শিক্ষিত করা, ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত,—এই সকল কথা কেবল কথামাত্র, তাহা হইলে তাহারা সকলই হতাশে ও ইউরোপীয়দিগের প্রতি অতিশয় বিদ্বেষভাবে এক সাধারণ সূত্রে সম্মিলিত হইয়া একটি সশস্ত্র সৈনিক শ্রেণীর ন্যায় পরস্পর ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া উঠিবে। ইহা অপেক্ষা নির্ব্বুদ্ধিপূর্ণ রাজনীতি আর কি সম্ভবে? কিন্তু ভারতবাসীদের উচ্চাভিলাষের দ্বার উদ্‌ঘাটিতকর, তাহা হইলে তুমি তৎক্ষণাৎ তাহাদের সকলের মধ্যেই প্রতিযোগিতা, আপনাপন দলের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা ও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ দেখিতে পাইবে। এইগুলি মন্দ হইলেও সমাজের শান্তির জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়। এরূপ হইলে ঘনসন্নিবিষ্ট সৈনিক শ্রেণীর পরিবর্ত্তে সকলেই গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম গ্রহণের জন্য পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিবে।

তখন তুমি সমগ্র জাতির মধ্যস্থ হইয়া সকলের মধ্যে বৃত্তিবিতরণের কর্ত্তা হইয়া উঠিবে।”

আমার বিবেচনায় এই সকল সারগর্ভ উক্তি ভারতবর্ষীয়দিগকে বিচার ও শাসনবিভাগের নিয়োগের পক্ষে সহজবুদ্ধিজাত অখণ্ডনীয় যুক্তি। ব্যয়সংক্ষেপের হেতুতে ঐরূপ করা আবশ্যক। ভারতবাসীদিগের ন্যায়সঙ্গত স্বাভাবিক উচ্চাভিলাষের পরিপূরণ জন্য ঐরূপ করা আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত শাসনপ্রণালী সুশৃঙ্খল বা সুব্যবস্থিত করিবার জন্য সহজজ্ঞানেও ঐরূপ করা আবশ্যক।

যে কোন রূপেই হউক, বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের সিবিলসরবিস্ যেরূপে সংগঠিত হইয়াছে, তাহাতে উহার বিলোপ দশা ঘটিবে। স্বদেশের গৌরবস্থানীয় অনেকেই এই সরবিসের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছেন। এই কার্য্যের বলে বিশ্বাসের পাত্র ও ক্ষমতার পাত্র হওয়া যায়, গুরুতর শক্তি ও দায়িত্বের পরিচালনা করা যায়, ভাল অথবা মন্দ করিবার অধিকার জন্মে। সাধারণ মানবের মধ্যে সমস্ত জীবিত কালেও এইরূপ ক্ষমতা ও অধিকার জন্মে না। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তারা বিশেষ লর্ড কর্ণওয়ালিস্ অতি সমীচীনতার সহিত এই সরবিস্ সংগঠিত করিয়াছিলেন। কর্ণওয়ালিস্ই বোধ হয় উহা বর্ত্তমান অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যে বিভাগে অধিবাসীর সংখ্যা দশ লক্ষ হইতে ত্রিশলক্ষ, যাহার পরিমাণ দুই হাজার হইতে দশ হাজার বর্গমাইল সেই বিভাগের কর্ত্তৃত্ব একজনের উপর সমর্পিত হয়; তিনিই সকল ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল হন, সকল বিভাগের কার্য্য তিনিই পর্য্যবেক্ষণ ও পর্য্যালোচন করেন।

সিবিলসার্জ্জন, পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট, ইঞ্জিনিয়ার এবং বিচার, শাসনকার্য্য ও রাজস্বসংগ্রহের ভার প্রাপ্ত অনেকগুলি সহকারী ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট কেবল তাঁহার আদেশে সৈনিক-জনোচিত শৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হন। তিনি গবর্ণমেণ্টের হস্ত ও চক্ষু স্বরূপ। তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি কার্য্যদক্ষতা ও প্রত্যুৎপন্ন মতির উপরেই বহুসংখ্য লোকের সুখ নির্ভর করে। ইহা নিশ্চয়ই একটি তেজস্বিতাসম্পন্ন ও গুণবহুল শাসনপ্রণালী এবং ইহা প্রবর্ত্তকদিগের সংগঠনক্ষমতার একটি স্মরণস্তম্ভ। কিন্তু এই শাসনকার্য্যের এইরূপ গঠনপ্রণালী কেবল বিদেশীদিগের গবর্ণমেণ্টের এবং বিদেশী ও যথেচ্ছাচার শাসনপ্রণালীরই যোগ্য। যে শাসনপ্রণালী জনসাধারণের মনোরঞ্জক ও জাতীয় বলিয়া পরিগণিত হইবে, তাহাতে ব্যক্তিবিশেষের উপর এইরূপ শাসনকার্য্যের ভার না দিয়া প্রজাসাধারণের প্রতিনিধিদিগের উপরেই উহা সমর্পণ করা উচিত। সমাজের যে সকল প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তি কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার যোগ্য, তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করার যত প্রয়োজন, ইঙ্গরেজী প্রথা অনুসারে সাধারণ মত দ্বারা নির্ব্বাচন করিবার প্রণালীর এক্ষণে তত প্রয়োজন নাই। লর্ড রিপন যে স্থানীয় আত্মশাসনপ্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহা দ্বারা সকল অভাবের পূরণ হইবে না। উহা নির্ব্বাচনপ্রণালীর উপর স্থাপিত হইয়াছে। স্থানীয় সমাজের অসম্পূর্ণতায় উহা দূষিত হইবে এবং যে সকল লোক দ্বারা স্থানীয় কার্য্য সাধিত হয়, তাঁহাদের অল্পবুদ্ধিতেও ঐ প্রণালীর অপব্যবহার ঘটিবে। যেরূপ সতর্কতা ও বিবেচনার সহিত ঐ প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবে, সেইরূপ সতর্কতা ও বিবেচনার উপ-

রই উহার কার্য্যকারিতা নির্ভর করিবে। কিন্তু এইরূপ দোষ থাকিলেও স্থানীয় লোক দ্বারা স্থানীয় কার্য্য চালাইবার প্রথা নিশ্চয়ই ন্যায়ানুমোদিত। ঐ সকল স্থানীয় লোক মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারী অপেক্ষা শাসনপ্রণালীর মূল সূত্রে যতই অনভিজ্ঞ হউন না কেন, ফলের সহিত তাঁহাদের অধিকতর নিকট সম্বন্ধ থাকাতে অনেক উপকারের সম্ভাবনা আছে। এরূপ হইলে ক্রমে ক্রমে স্থানীয় অধিবাসীদিগের মধ্য হইতে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য লোক নির্দ্ধারিত হইবে। এক্ষণে যে, সর্ব্বদা পবিবর্ত্তন ও স্থানান্তরিতকরণপ্রথা বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহা থাকিবে না। যে সকল কার্য্যের জন্য এক্ষণে আমাদিগকে ইউরোপ হইতে বিদেশী লোক এবং দেশেব ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদিগকে আনিতে হয়, সেই সকল স্থানীয় কার্য্যে স্থানীয় লোক নিযুক্ত করিলে, অল্প ব্যয়ে অধিক ফল ফলিবে।

আত্মশাসন-প্রণালী অনুসাবে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে ভারত বাসীদিগের স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতা আছে। বহুশত বৎসরের অরাজকতা ও অত্যাচার ঐ ক্ষমতা নির্ম্মূল কবিতে পারে নাই। ভারতের পল্লীগ্রামবাসিগণ আপনাদের ভূস্বামীর অধীনে একটি ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্র সমাজে সম্মিলিত ছিল। কর্ম্মচারিগণ পুরুষানু-ক্রমে আপনাদের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিত। অধিকাংশ লোক কোন কর্ম্মচারীকে অযোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে সেই বংশের আর এক ব্যক্তি সেই কার্য্যে নিয়োজিত হইত। ইঙ্গ-রেজ-শাসনে গ্রামের মণ্ডলের ক্ষমতা বিনষ্ট হইয়াছে, গ্রামের গোমস্তা ও পাটোয়ারির দায়িত্ব অন্তর্ধান করিয়াছে এবং পঞ্চায়-

তের অধিকার ও ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়াগিয়াছে। স্থানীয় আত্ম-শাসন ও স্থানীয় মধ্যস্থপ্রথার পরিবর্ত্তে বহুব্যয়সাধ্য শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্ব্বতন প্রথা এখন আর সম্পূর্ণরূপে পূর্ব্বের ন্যায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সম্ভবতঃ ভারত-বাসীদিগের পরম্পরাগত শাসনপ্রণালীর সহিত আধুনিক সভ্য-তার সামঞ্জস্য রক্ষাই লর্ড রিপনের প্রবর্ত্তিত স্থানীয় আত্ম-শাসনপ্রণালীর উদ্দেশ্য। এই শাসনপ্রণালী যেস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেই স্থানের লোক দ্বারাই উহা পরিচালিত হইবে। এতদ্দ্বারা ব্যবসায়ী, শিল্পী, মহাজন এবং স্বদেশের কৃষিজীবিগণ একতাসূত্রে সম্বদ্ধ ও জাতীয় জীবনে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে।

স্বাধীনতা ও আত্মশাসন-প্রণালীর পূর্ণ বিকাশে ইঙ্গলণ্ডের রাজনৈতিক বিধি সকল যেমন দৃঢ়ীভূত হইয়াছে, সেইরূপ আমা-দের আশা আছে যে স্থানীয় আত্মশাসন-প্রণালীতে ভারতের রাজনৈতিক বিধি সকলও দৃঢ়তর হইবে। আমরা সমগ্র সাম্রাজ্যে প্রতিনিধিশাসন-প্রণালীর বীজ রোপন করিয়াছি। এক্ষণে উহা পরিবর্দ্ধন করিতে হইবে, কিন্তু কেবল স্থানীয় আত্ম-শাসন-প্রণালীর পোষকতা করিলেই চলিবেনা, যেমন জ্ঞানের বিস্তার হইতেছে, তেমনই প্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর এবং গবর্ণরজেনেরলের মন্ত্রীসভাতেও প্রতিনিধিপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। এই সকল ব্যবস্থাপক সভা যে ভাবে সংগঠিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে ভারতবাসীদগের সম্পাদিত সংবাদপত্রে আন্দোলন হইতেছে। আমার বিশ্বাস, যেপর্য্যন্ত উহার সম্পূর্ণ সংস্কার না হয়, সেপর্য্যন্ত সংবাদপত্র সকল ঐ আন্দোলনে বিরত থাকিবে না। এখনকার ব্যবস্থাপক সভা যে, প্রহসনস্বরূপ হইয়া

উঠিয়াছে, তাহা বলিলে বোধ হয়, অত্যুক্তি হয়না। ব্যবস্থাপক-সভায় সরকারী কর্ম্মচারীদিগের আধিপত্যপ্রযুক্ত কেবল যে, স্বাধীন লোকের স্বাধীন ভাবে কার্য্যকরার পথ অবরুদ্ধ হইয়াছে, তাহা নহে, ঐ সকল কর্ম্মচারী গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকাতে আপনারাও স্বাধীনভাবে নিজের মতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন না। এখন ব্যবস্থাপক সভায় যে সকল ভারতবর্ষীয় সভ্য আছেন, তাঁহারা ক্রীড়া পুত্তুলের ন্যায় অবস্থিতি করেন। কোন এক জন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট কখন লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের যাহা বাঞ্ছনীয় নয়, সেইরূপ পরামর্শ দিতে পারেন না, যেহেতু তিনি এই লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের নিকট হইতেই কর্ম্ম পাইয়াছেন এবং তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির আশাও এই লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের হস্তেই ন্যস্ত রহিয়াছে। ধনশালী ও ক্ষমতাপন্ন জমীদারদিগের যে সকল কার্য্যদক্ষ ও বিশ্বাসী কর্ম্মচারী এক্ষণে বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য রহিয়াছেন, তাঁহারা বরং আপনাদের জিহ্বা ছেদ করিতে পারেন, তথাপি স্যার রিবর্স টমসনের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে সাহসী হন না। ইহা তাঁহাদের দোষ নয়। তাঁহারা কেবল স্বশ্রেণীর দৃষ্টান্ত ও সাবেক আমলের স্বদেশীয় দিগের মতানুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। উচ্চতর রাজকর্ম্ম চারীদিগের পদানত হইয়া থাকাই তাঁহাদের ধর্ম্ম। যদি তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করেন, তাহা হইলে, তাঁহাদের সপক্ষতা করিবেন, তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবের মধ্যে এমন কয়জন লোক আছেন? গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপকসভায় দেশের প্রকৃত নেতাদিগের কোনরূপ উচ্চ বাচ্য করিবার ক্ষমতা নাই, গবর্ণমেণ্ট ইহাদের অস্তিত্ব অবগত নহেন, রাজকীয় কাগজ

পত্রেও ইঁহাদের নামগন্ধ নাই। যদি লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর স্বয়ং এরূপ দুই একজন বাঙ্গালীকে আপনার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য করিতে চেষ্টা করেন যে, তাঁহারা বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তিতে সমগ্র দেশের প্রতিনিধি স্বরূপ, তাহা হইলেও তাঁহাদের নিয়োগে যে, আশানুরূপ ফললাভ হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এক ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া কিরূপে অনেক দিন স্বাধীনভাবের পরিচয় দিতে পারেন? ব্যবস্থাপক সভায় ভারতবাসীদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীনচেতা ব্যক্তিকে সভ্যের পদে ব্রতী করিতে হইলে এরূপ কোন প্রণালী উদ্ভাবিত করা আবশ্যক, যাহাতে জনসাধারণের নেতারা আপনাদের মধ্যে যোগ্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে পারেন। গবর্ণমেণ্টের নির্ব্বাচনের পরিবর্ত্তে এখন জনসাধারণ কর্ত্তৃক প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনপ্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। ইহাই বর্ত্তমান দূষিত নিয়মের প্রতীকারে একমাত্র ফলদায়ক উপায়। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপকসভায় এই প্রণালী অনুসারে সভ্য নির্ব্বাচন হওয়াতে অনেক ফল ফলিতেছে। প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপকসভায় প্রতিনিধিপ্রণালী বিস্তৃত করা যে, সম্ভবপর তাহা এইরূপ ফলাবস্তে প্রতিপন্ন হইতেছে। স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল এবং তাঁহার পরবর্ত্তী পদাধিকারী বাবু প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিশেষ যোগ্যতার সহিত বঙ্গের জমীদারদিগের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছেন, এবং গিবন সাহেব অপেক্ষা স্বশ্রেণীস্থ লোকদিগের অধিকতর যোগ্য প্রতিনিধি আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

ঐ প্রণালী অনুসারে কিভাবে কার্য্য করিতে হইবে, তাহার

প্রত্যেক সূক্ষ্ম বিষয়ের বিচার করা এখন নিষ্প্রয়োজন, তবে গবর্ণমেণ্টের হস্তে কিয়দংশ সভ্যের অন্ততঃ একতৃতীয়াংশ সভ্যের নিয়োগভার থাকা উচিত। যদি ব্যবস্থাপকসভার সভ্যসংখ্যা ত্রিশ হয়, তাহা হইলে জনসাধারণকে আপনাদের মধ্য হইতে কুড়ি জন সভ্য নির্ব্বাচন করিবার অধিকার দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপ নির্ব্বাচনে প্রদেশের রাজধানীর পাঁচ জন সভ্য থাকিবেন। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন রাজধানী নাই, দেশের উপর কলিকাতার ন্যায় যাহার অধিকতর ক্ষমতা আছে। তথাপি এখন বাঙ্গালার ব্যবস্থাপকসভায় কলিকাতার একজনও প্রতিনিধি নাই। ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিনিধি লওয়া উচিত। অবশিষ্ট সভ্যের জন্য এক একটি প্রদেশের কয়েকটি জেলা লইয়া এক একটি চক্র সংগঠিত করিতে হইবে। পরিমাণ ও যোগ্যতা অনুসারে প্রত্যেক চক্র হইতে দুই, তিন, কি চারি জন সভ্য লইতে হইবে। ডিষ্ট্রিক্ট ও মিউনিসিপাল বোর্ডের সভ্যেরা ঐ সকল সভ্য নির্ব্বাচন করিবেন।

যদি ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে সূক্ষ্মরূপে উপস্থিত বিষয়ের কার্য্যপ্রণালী নির্ব্বাহ করা কঠিন নহে। শিক্ষিত সম্প্রদায় হইতে উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করাই এখন প্রধানতঃ আবশ্যক। যখন ব্যবস্থাপকসভা এইরূপে সংগঠিত হইবে, তখন উহার কার্য্যপ্রণালী ও ক্ষমতা সেই পরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। শাসনবিভাগের কার্য্য পরীক্ষা করা এই প্রতিনিধিসভার কার্য্য; এজন্য ইহার উপর শাসনসংক্রান্ত কাগজপত্র দেখিবার ক্ষমতা দেওয়া উচিত। এতদ্ব্যতীত এই সভার আয়-ব্যয়ের সম্বন্ধে কিছু ক্ষমতা থাকাও বিধেয়। প্রতি-

বৎসর নানা খেয়ালে বহু অর্থব্যয় হয়, নষ্ট করা হয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই ব্যয়ের সহিত জনসাধারণের স্বার্থ-সম্বন্ধ আছে, কিন্তু এ বিষয়ে জনসাধারণের মতামত প্রকাশের কোন অধিকার নাই। ব্যয়ের সংখ্যা, যে বিষয়ে ব্যয় করিতে হইবে তাহা আবশ্যক কি না এবং এ সম্বন্ধে সাধারণের মতামত কি, তাহা ঠিক না করিয়া এরূপ অর্থ ব্যয় করা হইবে না। অবশেষে ইহা বলা উচিত যে, গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি সভ্যদিগের পারদর্শিতার উপরই ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কার্য্যকারিতা নির্ভর করে। ব্যবস্থাপক সভার ঐ সকল সভ্যেরা আপনাদের দক্ষতার পরিচয় না দিলে জেলার যে সকল রাজকর্ম্মচারীর হস্তে এখন ভয়ঙ্কর ক্ষমতা রহিয়াছে, তাঁহারা নিশ্চয়ই ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন। প্রদেশীয় ব্যবস্থাপকসভায় ভারতবর্ষীয় সভ্যদিগের স্বাধীনভাব না থাকিলে স্থানীয় বোর্ডের মর্য্যাদা রক্ষা পাইবে না। এইরূপে কার্য্য হইলে ক্রমে প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব নির্দ্ধারিত হইবে, আত্মীয়স্বজনদিগকে অযথারূপে কার্য্যে নিয়োগ করা প্রভৃতি যে কেলেঙ্কারি আছে, তাহা কমিয়া যাইবে। এই সকল নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করা, আর যথোপযুক্ত প্রতিনিধি প্রণালী অনুসারে ব্যবস্থাপকসভা সংগঠিত করা, উভয়ই সমান আবশ্যক।

ইঙ্গলণ্ডের সাধারণ মত ও ভারত-বর্ষের শাসনপ্রণালী।

ভারতবর্ষসংক্রান্ত বিষয়ে ইংলণ্ডের লোক এখন বিশেষ মনোযোগ দিতেছেন। যাঁহাদের সহিত ভারতবর্ষের সংস্রব আছে, এটি তাঁহাদের বড় আহ্লাদের বিষয়। ভারতবর্ষের প্রতি এইরূপ অভিনিবেশে একটি ভাল ফল ফলিয়াছে। অধিক জানাশুনা হওয়াতে আমাদের নৈতিক জ্ঞানের উদয় হইয়াছে। প্রকৃত ঘটনায় অভিজ্ঞতা লাভ হওয়াতে আমরা আমাদের অভাব এবং আমাদের দায়িত্ব বুঝিতে পারিতেছি, পক্ষান্তরে ইউ-রোপের সাধারণমতের মঙ্গলকর কার্য্যকারিতায় ভারতের শাসকবর্গ যেরূপ পরিচালিত হইয়া থাকেন, স্পষ্টতঃই তাহাতে ভারতবাসী প্রজাদিগের লাভ হয়।

আমি এই ক্ষমতার উপকারিতা অতিরঞ্জিত করিতে ইচ্ছা করি না। আমি স্বীকার করি যে, জাতিগত বিদ্বেষপ্রযুক্ত অনেক সময়ে ইঙ্গলণ্ডবাসীর মত পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু এরূপ স্থলেও ইঙ্গলণ্ডবাসীদিগের মত ভারতে আঙলোইণ্ডিয়ান-দিগের মত অপেক্ষা অধিকতর মঙ্গলকর ক্ষমতা বিস্তার করি-য়াছে। ইঙ্গলণ্ডবাসিগণ অপেক্ষাকৃত শিষ্ট ও অলঙ্কারপূর্ণ ভাষায় আপনাদের মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি বঙ্গদেশে বাঙ্গালিদিগকে যে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দেওয়া হইয়াছে, * কোন

* ভারতপ্রবাসী ইঙ্গরেজরা আপনাদের সংবাদপত্রে যে ভাষা প্রয়োগ করিতে লজ্জিত হন না, সেই ভাষা কিরূপ, তাহা জানাইবার জন্য ১৮৮৫ অব্দের জুন মাসের 'বেঙ্গল টাইম্‌স্' নামক সংবাদপত্র হইতে নিম্নে একাংশ

সংবাদপত্রে অথবা কোন প্রকাশ্য সভায় সেরূপ ভাষা প্রয়োগ করিতে দেওয়া উচিত নহে। মানুষ ঘটনাস্থল হইতে দূরে থাকিলে অপেক্ষাকৃত অল্প উত্তেজনা ও অল্প ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া সেই ঘটনার বিচার করিয়া থাকে। আবার অল্প সময়ের মধ্যেই ঘাতের প্রতিঘাত দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে যে সকল মত অসঙ্গত ও দেশের অনুপকারক বলিয়া নিন্দিত হইত, উচ্চতর রাজপুরুষগণ এখন সেই সকল মত সমর্থন করিতেছেন। প্রতি বৎসর ইহাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাঁরা জাতীয়

উদ্ধৃত করিতেছি। ইলবর্ট বিল লইয়া, যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়, তাহা তিরোহিত হওয়ার পরে উহা বাহির হইয়াছিল:—

"বাবু লালমোহন ঘোষ ডেপ্টফোর্ডবাসী চারিশত লোকের প্রার্থনানুসারে পার্লিয়ামেন্টে তাহাদের উদারনীতিক প্রতিনিধি হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ডেপ্টফোর্ডের এই প্রলাপকারী অপদার্থ চারিশত লোকের, আমাদের স্বদেশে, রাজনৈতিক সৎকার্য্যে ব্যাপৃত থাকার পরিবর্ত্তে বাতুলাশ্রমে থাকাই উচিত। যদি একজন বাঙ্গালী বাবু পার্লিয়ামেন্টে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে উহা অবিংশে আর্য্যদিগের একটি প্রিয় আবাসক্ষেত্র হইবে। নূতনত্বের জন্য এইরূপ পাগলামি দেখাইতে গিয়া এই ইঙ্গরেজের দল ইহার পর আর কোথায় গিয়া থামিবেন? যদি একটি শিম্পাঞ্জিকে কোন নগরের প্রতিনিধি হওয়ার জন্য শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা হইলেও নিঃসন্দেহ নির্ব্বাচনকারীদিগের মধ্যে তাহার অনেক আশা ভরসা থাকে। যিনি ঢাকায় বক্তৃতা করিয়া "গন্ধ কুন" এই বিখ্যাত উপাধি লাভ করিয়াছেন, সেই ঘোষ বাবু অপেক্ষা বোধ হয়, শিম্পাঞ্জিও একটি জ্ঞানী জন্তু। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ডেপ্টফোর্ডের চারিশত লোক ইঙ্গরেজ নির্ব্বাচকদিগের প্রতিনিধি নহে। বাবুও অর্থ ব্যয় করিয়া বুঝিতে পারিবেন যে, অবশেষে ইঙ্গরেজদিগের জাতীয় ভাব উদ্দীপ্ত হইয়াছে। পার্লিয়ামেন্টে প্রবেশের চেষ্টা করিয়া তিনি যেরূপ অহঙ্কার ও অন্ধবিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছেন, উত্তেজিত ছোট লোকের দল কর্ত্তৃক তাহার পুরস্কার হওয়া উচিত। যে পাজি বাঙ্গালী ইঙ্গরেজ মহিলাকে বিবাহ করিতে সাহসী হয়, তাহার সম্বন্ধেও এইরূপ করা উচিত। যে ইঙ্গরেজমহিলা ভারতবাসীকে বিবাহ করে, আমাদের মতে তাহাকে বেহায়া বেশ্যার মত বারে খাড়া করিয়া দেওয়া উচিত। সে স্ত্রী জাতির কজ্জল ও ইঙ্গরেজ জাতির কলঙ্কস্বরূপ।"

আত্মাদর অপেক্ষা উচ্চতর শক্তির দোহাই দিয়া সাধারণ মতের তীব্রতা কোমলতায় পরিণত করিতেছেন এবং বর্ত্তমান ধারণা ও অনুভূতি পরিবর্ত্তিত করিয়া তুলিতেছেন।

ভারতবর্ষের সহিত যাঁহাদের বিষয়কার্য্যে কোন সংস্রব নাই, যাঁহারা ভারতবর্ষ চক্ষেও দেখেন নাই, ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা ভিন্ন ভিন্ন বিষয় হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাঁহারা ভারতবর্ষসংক্রান্ত উৎকৃষ্ট গ্রন্থসকল প্রণয়ন করিয়াছেন। ঐ সকল গ্রন্থে আমাদের ভারতশাসন-নীতির সম্বন্ধে, আমাদের ভারতসাম্রাজ্যের সংগঠন বিষয়ে, আমাদের ভারতশাসনের ফলের সম্বন্ধে এবং আমাদের যে সকল বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ বিপদ ঘটিতে পারে, তদ্বিষয়ে প্রগাঢ় চিন্তাপ্রসূত উৎকৃষ্ট রচনা থাকে। এতদ্ব্যতীত ঐ সকল পুস্তকে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও অনেক কথা জানিতে পারা যায়। ভারতের দূরদর্শী সরকারী কর্ম্মচারিগণ ঐরূপ গ্রন্থে উক্ত বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা ঐ সকল কথা মূল্যবান। সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত না থাকায় ঐ সকল লেখকদিগের একটি বিশেষ সুবিধা আছে। যাঁহারা ভারতবর্ষে অনেক দিন কাজ করিয়াছেন, তাঁহারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করেন, তাহা তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে সমস্ত জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে পড়িয়া প্রায়ই সংকীর্ণ হইয়া উঠে। যাহা হউক, সরকারী এবং বেসরকারী আংলোইণ্ডিয়ানেরা ভারতবর্ষের সম্বন্ধে অনেকগুলি ভাল ভাল পুস্তক লিখিয়াছেন। কিন্তু প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সরকারী লোকে স্বয়ং যে কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, সেই কার্য্যের অযথা প্রশংসা করিতে গিয়া তাঁহারা অতিরিক্ত আত্ম প্রশংসার আবর্ত্তে পতিত

হইয়া থাকেন। এই শ্রেণীর লেখকেরা উচ্চ পদের সহিত যে পরিমাণে সংস্পৃষ্ট থাকেন, সেই পরিমাণে আপনাদের দোষ ঢাকিয়া কথা কহেন, অথবা আপনাদের কার্য্যাবলীর বিবরণ মাত্র লিখিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের লিখিত বিবরণ হইতে অনেক বাদ দিতে হয়। লব কিংবা গেডিস্—যাঁহারা আপনাদের কার্য্য সম্পন্ন করিবার পূর্ব্বেই ইহলোক হইতে অপসারিত হইয়াছেন,—এবং মেজর ইবান্সবেল, হিউম্ অথবা কর্ণেল অসবোর্ণ—যাঁহারা কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ভারতের মঙ্গল সাধন উদ্দেশে অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা আমার এই কথার বিষয়ীভূত নহেন। ইহাদের সংখ্যা অতি অল্প থাকাতে আমি সাধারণত যাহা বলিয়াছি, তাহার কোনও পরিবর্ত্তন হইতেছে না। ভারতে আমাদের অধিকারস্থাপনে আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক বিষয় সম্বন্ধে যে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, যে গোলযোগে ভারতের জনসাধারণ নিঃস্ব ও নিরবলম্ব হইয়া পড়িয়াছে, তাহার প্রকৃত তত্ত্ব সরকারী কর্ম্মচারীদিগের প্রণীত গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায় না। জেতা ও বিজিতদিগের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য থাকাতে যে অশুভ ফলের উৎপত্তি হইতেছে, তৎসম্বন্ধেও কোন কথা ঐ সকল পুস্তকে পাওয়া যায় না। আমরা ভারতবর্ষে থাকাতে ভাল কি মন্দ ফল হইয়াছে, তাহা দেখিতে গেলে ঐ সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ই ভাল করিয়া আলোচনা করা উচিত। কিন্তু যে সকল সরকারী গ্রন্থকার আপনাদের দোষক্ষালনে ব্যতিব্যস্ত, তাঁহারা ঐ প্রয়োজনীয় বিষয়ের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও স্বীকার করেন না। যতদিন ব্যবস্থাদাতা ষ্টিফেন এবং স্যার লিপেল্ গ্রিফিনের ন্যায় সরকারী কর্ম্মচারীরা

ভারতগবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণতা, অপরিবর্ত্তনীয়তা ও গুণগরিমা ঘোষণা করিবেন, ততদিন তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদী লেখকেরা সাহস ও দক্ষতার সহিত আপনাদের মত প্রকাশ করিতে থাকিবেন। এরূপ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। হিণ্ডমান্, কী অথবা কোনেল সাহেবের গ্রন্থ কেবল সমালোচনা মাত্র। এই সকল গ্রন্থে অপরের মত খণ্ডিত হইয়াছে মাত্র, পুনর্গঠনের সম্বন্ধে কিছুই লিখিত হয় নাই। পুনর্গঠনই এখন ভারতে বিশেষ আবশ্যক। অস্বোর্ণ্, কেয়ার্ড, ব্লণ্ট সাহেবের পুস্তক, বিশেষ ডাক্তর কন্‌গ্রিব্ প্রণীত গ্রন্থ এবং "ইঙ্গলিস্ সিটিজেন্ গ্রন্থাবলীর" * অন্তর্গত ভারতবর্ষ সংক্রান্ত পুস্তকের রচনা কুসংস্কারজনিত নহে। ডাক্তর কন্‌গ্রিব্ এবং "ইঙ্গলিস্ সিটিজেন্ গ্রন্থাবলীর" অন্তর্গত ভারতবর্ষসংক্রান্ত গ্রন্থের লেখক, এই উভয়ের মধ্যেই কেহই ভারতবর্ষ দেখেন নাই। আলোচ্য বিষয়ে উক্ত গ্রন্থকারদিগের বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকাতে কেহই কেবল দোষদর্শী অথবা কেবল নিরবচ্ছিন্ন গুণদর্শী হইয়া পড়েন নাই। যে শাসননীতির উপর পুনর্গঠনের ভিত্তি স্থাপিত হইতে পারে, তাহার বিবরণ এই সকল গ্রন্থে পাওয়া যায়।

আমি পূর্ব্বে হিণ্ডমান্ ও কী সাহেবের নাম উল্লেখ করিয়াছি। যদিও তাঁহাদের সকল মতের সহিত আমার মতের একতা নাই, তথাপি তাঁহারা আমার শ্রদ্ধার পাত্র। আমি যাঁহাদের নামের সহিত কনেল্ সাহেবের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাঁহাদের লেখা অপেক্ষা কনেল্ সাহেবের ভারতবর্ষীর রেলওয়েসংক্রান্ত প্রস্তাব সকল অনেক ভাল। স্যার জেমস কেয়ার্ড সাহেবের

* Colonies and Dependencies, Part I, India, by J S. Cotton (Macmillan, 1883).

গ্রন্থে অনেক প্রয়োজনীয় ও ব্যবহার্য্য কথা আছে। উইলফোর্ড ব্লণ্ট সাহেব "ফর্টনাইটলি রিবিউ" নামক সাময়িক পত্রে যে-কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তৎসমুদয়ে ভারতের সহিত ইঙ্গলণ্ডের কিরূপ প্রকৃত সম্বন্ধ আছে, তদ্বিষয়ে গভীর দূরদর্শিতা প্রকাশ পাইয়াছে। ঐ সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়াতে একদিকে যেমন আংলোইণ্ডিয়ানদিগের মধ্যে বিদ্বেষ ও ক্রোধের সঞ্চার হয়, অন্যদিকে তেমনি একজন ইঙ্গরেজকে অল্প কাল ভারতবর্ষ পরিভ্রমণের পর সমস্ত বিষয় এত সূক্ষ্মরূপে বলিতে ও বর্ণনা করিতে দেখিয়া, ভারতবর্ষীয়েরা যুগপৎ হৃষ্ট ও বিস্মিত হইয়া থাকে। যে ফসেটের অকালমৃত্যুতে সমগ্র ভারত হাহাকার করিতেছে, তিনি ভারতবর্ষের হিতের জন্য আপনার সমস্ত ক্ষমতা বিনিয়োগ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের অপেক্ষা আরও উচ্চতর ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের প্রতি প্রগাঢ় সমবেদনা এবং ভারতবর্ষসংক্রান্ত গভীর জ্ঞানের জন্য এড্‌মণ্ড বর্ক চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা এখন সকলের গৃহে গৃহে গোষ্ঠীকথা স্বরূপ হইয়াছে। সকল সময়েই ঐ সকল কথা একটি বিশেষ শক্তির পরিচালনা করিবে। বর্ত্তমান সময়ের রাজনীতিজ্ঞের মধ্যে মহত্তম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী গ্লাডষ্টোন সাহেবের লিখিত রচনাবলী এবং ব্রাইট সাহেবের বক্তৃতাসমূহে ইঙ্গরেজদিগের হৃদয়ে একটি অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করিয়া দিয়াছে। ইঙ্গলণ্ডবাসীদিগের মনে তাঁহাদের অধীনস্থ সর্ব্বপ্রধান সাম্রাজ্যের প্রতি কর্ত্তব্যতার আবির্ভাব করিয়া দিবার জন্য ইঁহারা যথার্থই ভারতবাসীদিগের কৃতজ্ঞতার পাত্র।

আয়র্লণ্ডের সংস্কারবিষয়ে ইঙ্গরেজ জাতির মতামতে কি ফল ফলিয়াছে, তাহা বুঝিলে আমরা ভারতবর্ষসম্বন্ধে ইঙ্গরেজ জাতির মতামতের কার্য্যকারিতা বুঝিতে পারিব। আয়র্লণ্ডের অভ্যন্তরীণ আন্দোলনে কোন ফল হয় নাই। যখনই আয়র্লণ্ডবাসীদিগের আন্দোলনের সহিত ইঙ্গরেজ জাতির অভিমতের একতা ঘটিয়াছে, তখনই আয়র্লণ্ডের কিছু না কিছু লাভ হইয়াছে। ভারতবর্ষের সম্বন্ধেও তাই। ভারতবর্ষের শাসন-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান, যাঁহারা কেবল কবির কল্পনা বলিয়া মনে করেন, যাঁহাদের মতে উহা কার্য্যে পরিণত করার বিষয় নয়, তাঁহাদের কথা নিতান্ত অলীক নহে। আভ্যন্তরীণ বল-প্রয়োগে যে, কোন ফল হয় না, তাহা আমরা জানি। উহাতে গবর্ণমেণ্ট কেবল প্রকাশ্য আন্দোলন চাপিয়া রাখেন মাত্র। কিন্তু জাতীয় সমুত্থান উহার পরিণাম। অতএব শান্তভাবে ভারতবর্ষসংক্রান্ত সমস্ত সমস্যার সমাধান কেবল ইঙ্গরেজদিগের উপরই নির্ভর করিতেছে। তাহারাই কেবল স্বদেশের জন-সাধারণের মতের বাহ্য শক্তির দ্বারা আংলোইণ্ডিয়ানদিগের প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে সমর্থ।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষজাত আন্দোলনের যে, শক্তি নাই, ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধির শাসনকালই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। অশেষ প্রশংসা না করিয়া আমি লর্ড রিপনের নাম উল্লেখ করিতে পারি না। ভারতে পদার্পণের দিন হইতে ভারত-ত্যাগের দিন পর্য্যন্ত তিনি কেবল ভারতবাসীদিগের জন্য পরি-শ্রম করিয়াছেন। তাঁহার শাসনকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। যে নীতি ভবিষ্যতে কোন শাসনকর্ত্তা উলঙ্ঘন করিতে পারিবেন

না, সেই উন্নতিশীল উদার রাজনীতির প্রবর্ত্তক বলিয়া, ভারত-বর্ষের লোকের প্রতি সমবেদনাপর বলিয়া, প্রগাঢ় উন্নতিশীল রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া এবং সমস্ত গবর্ণরজেনেরলের মধ্যে "ভারত বন্ধু" বলিয়া ইতিহাসে তাঁহার নাম কীর্ত্তিত হইবে। তাঁহার পররর্ত্তী গবর্ণরজেনেরলদিগের নাম তাঁহার নামের সহিত এক শ্রেণীতে গ্রথিত হইয়া যদি ভবিষ্যবংশীয়দিগের মধ্যে কীর্ত্তিত হয়, তাহাহইলে সেই গবর্ণরজেনেরলদিগের সম্মানের এক শেষ হইবে, কিন্তু তবুও মহাত্মা লর্ড রিপন কার্য্যত অতি অল্পই করিয়া গিয়াছেন। যদিও দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার বিপক্ষ-দিগের ঘোরতর উন্মত্ততার জন্য এইরূপ বিপ্লব অনেকটা ঘটি-য়াছে তথাপি বলিতে হইবে যে, তাঁহার চেষ্টায় ভারতে রাজ-নৈতিক আন্দোলন কতকটা উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার শাসনসময়ে বেশী কিছু কাজ হইয়াছে, ব্যবস্থাপুস্তক দেখিয়া তাহা বোধ হয় না। তিনি যে, বাধাবিপত্তিতে পরিবৃত ছিলেন, তাহা আমি বেশ জানি। তিনি হয়ত এমন আরও বাধাবিপত্তিতে পড়িয়াছিলেন যে, তাহা আমি জানি না। তাঁহার স্বদেশীয়গণের অনুচিত জাতি-বিদ্বেষ ও অন্ধবিশ্বাসে তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। নিরবলম্ব ও নিঃসহায় হওয়াতে তিনি শক্তিশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। যে বিপদে তিনি পরিবেষ্টিত হইয়াছিলেন, তাহা তিনিই হউন বা তাঁহার অবস্থাপন্ন আর যেই হউন, কেহই একাকী অতিক্রম করিতে পারেন না।

লর্ড রিপন এখনও ভারতের কার্য্য হইতে বিরত হন নাই। ভারতবর্ষ অপেক্ষা স্বদেশে থাকিয়া তিনি অধিক পরি-মাণে ভারতের মঙ্গল সাধন করিতে পারিবেন। ইহা মনে

হইলে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হয়। তিনি যাহা করিয়াছেন, ইঙ্গলণ্ডের জনসাধারণ তাঁহার অনুকূল পক্ষে মত দিবেন, সেই মতের পরিচালনে লর্ড রিপোনের ক্ষমতা আছে বলিয়া এখনও তাঁহার নিকট অনেক আশা করিতে পারি। তাঁহার উপর ভারতবাসীদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। ভারতবাসিগণ তাঁহার প্রতি প্রায় দেবতানির্ব্বিশেষে ভক্তি ও প্রীতি দেখাইয়া থাকেন। হিমালয় হইতে সুদূর কুমারিকা পর্য্যন্ত প্রত্যেক ইঙ্গরেজীশিক্ষিত লোকের গৃহে তাঁহার নাম মোহিনী শক্তি বিকাশ করিয়া দিতেছে। এই সকল বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে আপনাদের অধিনায়কের পদে বরণ করা ইঙ্গলণ্ডের জনসাধারণের একান্ত কর্ত্তব্য।

এই অবসরে আমি (লর্ড রিপনের শাসননীতির সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় উল্লেখের পূর্ব্বে) অতীত কালের ঘটনার উল্লেখ করিয়া লর্ড রিপনের পূর্ব্ববর্ত্তী গবর্ণরজেনেরলদিগের কার্য্যকুশলতা ও গুণগরিমা স্বীকার করিতেছি। পূর্ব্বে যে উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা প্রতিপন্ন করিতে পারিব বলিয়াই আমি নিজের ইচ্ছায় এরূপ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। ইঙ্গরেজকর্ত্তৃক ভারতবিজয় ন্যায়বিগর্হিত বলিয়া যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহারা অন্ধসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ভারতশাসনের প্রত্যেক বিষয় দেখিয়া থাকেন। আমরাও ইঙ্গরেজকর্ত্তৃক ভারতবিজয়ের (যে অবৈধ ঘটনার উত্তেজনায় বিজয়ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে, সেই অবৈধ ঘটনার এখন আর খণ্ডন হয় না) নিন্দা করি। কিন্তু ভারতবর্ষ জয়ে যে, অনেক উপকার হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। গবর্ণরজেনেরলগণের প্রত্যেকেই

যেমন একদিকে ব্রিটিশাধিকার সম্প্রসারিত করিয়াছেন, তেমন অপরদিকে প্রত্যেকে সমস্ত অধিকৃত রাজ্যে শান্তিময় শাসন প্রণালী সুদৃঢ় করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। যদিও গবর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্রবিষয়িণী নীতিতে যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিয়াছে, তথাপি স্বরাষ্ট্র-বিষয়িণী নীতিতে ক্রমাগত আভ্যন্তরীণ উন্নতি হইয়াছে। লর্ড কর্ণওয়ালিস আধুনিক দেওয়ানী শাসনবিভাগের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সিবিলসর্ব্বিস্ তাঁহাদ্বারাই সংশোধিত হয়। ভারত-বর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই ভারতবাসীরা গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ রাজকার্য্যে বঞ্চিত হইবে না, এ নীতি প্রথমে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্ প্রবর্ত্তিত করেন*। ভারতবর্ষের যে কৃষিকার্য্য হইতে এখন সমূহ ফললাভ হইতেছে, লর্ড ডালহৌসী তাহার উৎকর্ষসাধনের উপায় কবিয়াছেন। স্যাব জন্ লরেন্স কর্ত্তৃক ভারতের প্রধান প্রধান নগরে মিউনিসিপালিটির প্রথা প্রচ-লিত হইয়াছে†। লর্ড মেও রাজস্বের স্বতন্ত্রীকরণ-প্রথার প্রতি-

* বর্ত্তমান সময়ে নয়, কিন্তু ১৮৩৩ অব্দে পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক এই নিয়ম বিধিবদ্ধ হয় যে, ভারতবর্ষের কোন অধিবাসী কিংবা মহারাণীর ভারতবর্ষীয় কোন প্রজা আপনার ধর্ম্ম, জন্মভূমি, বংশ বা বর্ণের জন্য কোম্পানির অধীনে কোন রাজকার্য্যে বঞ্চিত হইবে না। ১৮৫৮ অব্দে মহারাণীর ঘোষণাপত্র অনুসারে যখন ভারতবর্ষের শাসনভার কোম্পানির হস্ত হইতে মহারাণীর হস্তে আইসে, তখনও ঐরূপ আশ্বাসবাক্য দেওয়া হইয়াছিল। লর্ড নর্থব্রুক ও লর্ডনভায় ঐরূপ বলিয়াছিলেন,—"রাজ্যাধিকারলোলুপ লর্ড ডালহৌসীই হউন, সিপাহিযুদ্ধের জন্য দায়িত্বসম্পন্ন লর্ড কানিঙ্গই হউন, দেশের আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্যে অভিজ্ঞ লর্ড লরেন্সই হউন, কিংবা আবাল্য রক্ষণশীলসম্প্রদায়ের অন্তর্নিবিষ্ট লর্ড মেওই হউন, সকলেই সমভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, শ্রেণী বা জাতি বিচার করা উচিত নয়। মহারাণীর সকল শ্রেণীর প্রজাবর্গের জন্যই এক আইন হওয়া উচিত।"

† ১৮৬৪ অব্দে ৩১এ আগষ্ট স্যার জন লরেন্স নিম্নলিখিতভাবে বাঙ্গা

ষ্ঠা করিয়াছেন। এমন একজনও গবর্ণরজেনেরল নাই, যাঁহার নামের সহিত প্রজাসাধারণের উপকার, শিক্ষা-বিস্তার এবং রাজনৈতিক শিক্ষার সম্বন্ধে উদার ও পরিমার্জ্জিত ব্যবস্থার সংযোগ করা না যাইতে পারে।

এ পর্য্যন্ত যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে, আমার মতে তাহাই চিরস্মরণীয় হইবার উপযুক্ত বিষয়। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, আমাদের বিজয়বাসনার সহিত রাজ্য দৃঢ়ীকরণ বাসনাও সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে। প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে গেলে শান্তিস্থাপন একান্ত আবশ্যক। পূর্ব্ববর্ত্তীবংশীয়দিগের সমবেত চেষ্টাতেই অনেক প্রধান প্রধান বিষয়ের সংস্কারের সূচনা হইয়াছে। যদি যুদ্ধবিগ্রহের সময় শেষ হইয়া থাকে, ভারত-বিজয়-কার্য্য যদি সম্পূর্ণ হইয়া থাকে, আমাদের ভবিষ্যৎ শাসনকর্ত্তা-দিগকে যদি মহাবীর সেকন্দর শাহের ন্যায় পৃথিবীতে আর জয় করিবার স্থান নাই বলিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে হয়, যদি ভারতগবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীর জাতীয় পুনঃসংগঠনের

বলেন তাহাতে আমাদের বর্ত্তমান রাজনীতির আভাস পাওয়া যায়— 'ভারতে মিউনিসিপালপ্রথা বদ্ধমূল হইলে সাধারণের অনেক উপকারের আশা করা যায়। ভারতবর্ষের সমস্ত নগরে সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধনের জন্য প্রধানতম গবর্ণমেণ্ট অথবা প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্ট যথোপযুক্ত অর্থ কিংবা কর্ম্মচারী যোগাইতে সমর্থ নহেন। ভারতবর্ষের অধিবাসীরা আপনাদের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। মিউনিসিপালিটিসম্বন্ধীয় ভাব তাহাদের মনে নিহিত আছে। পল্লীসমাজ এক একটি ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্র। ভারতের প্রাচীন শাসনপ্রথার মধ্যে এখন ইহাই বর্ত্তমান রহিয়াছে। ভারতবর্ষে আমরা যে অবস্থার অধিকারী হইয়াছি, তাহাতে আমাদের কর্ত্তব্য, এবং আমাদের রাজনীতি যে ভাবেই দেখা যাউক না কেন, উভয় দিকেই আমাদিগকে ভারতবর্ষের কার্য্য সম্ভবমত ভারতবর্ষীয়দিগকে দিতে প্রবর্ত্তিত করে।"

জন্য আপনাদের সমস্ত, চেষ্টা বিনিয়োগ করেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, আমাদের এই সুযোগ আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণের পরিশ্রমের ফলে হইয়াছে। যে পরিবর্ত্তন হওয়ার উপক্রম হইয়াছে, ভারত সাম্রাজ্যের সমুদয় অংশে যে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, সেই পরিবর্ত্তনের পথ প্রথমে তাঁহারাই প্রস্তুত করেন। সভ্যতা, শান্তি ও সুখসমৃদ্ধির বিস্তর উন্নতি হইয়াছে এবং পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভ্যন্তরীণ বিপ্লব গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতাতেই সংসাধিত হইয়াছে।

পার্লিয়ামেণ্টের লর্ড সভায় লর্ড রিপনের বিপক্ষদলের মধ্যে একজন সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি রিপনের প্রবর্ত্তিত রাজনীতির এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—"এই নীতির বলে ইউরোপীয়দিগের হস্ত হইতে সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা ক্রমে ভারতবর্ষীয়দিগের হস্তে যাইবে।" লর্ড লীটন এ সম্বন্ধে এই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"ইহার অর্থ কি এই নহে যে, আমরা ভারতবর্ষ শাসন করিতে যাইয়া বিকৃত অবস্থায় পতিত হইয়াছি এবং সেই অবস্থা হইতে যত শীঘ্র পারা যায়, বিমুক্ত হইতে চেষ্টা করিতেছি? ভারতবর্ষীয়দিগকে আমাদের স্থলে কার্য্য করিতে শিখাইবার জন্য আমরা নিঃসন্দেহ কিছুকালের নিমিত্ত ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে, (যত শীঘ্র সিদ্ধ হয় ততই ভাল) আমরা ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিব। ভারতের প্রতিনিধি সকল যাঁহাদিগকে উপযুক্ত মনে করেন তাঁহাদের হস্তে রাজ্যশাসনের ভার সমর্পণ করিবেন।" ইহা লর্ড লীটনের কথা, আমার নহে। যে রাজনীতিজ্ঞ এক সময়ে মহারাণীর প্রতিনিধি ছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই জানি-

তেন যে, তাঁহার কথা বিস্মৃতির অতল সাগরে নিমজ্জিত হইবার নহে। এরূপ জানিয়াও এবং আপনার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াও তিনি এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ভারতের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের মধ্যে হৃদয়ের উত্তেজনাসম্ভূত যে ভাব সর্ব্ববাদীসম্মত হইয়া উঠিয়াছে, উহা তাহারই প্রতিধ্বনি মাত্র। বঙ্গদেশে প্রায় সমস্ত বেসরকারী ইয়ুরোপীয় কলিকাতায় যে স্বার্থসংরক্ষণী সভা স্থাপন করিয়াছেন, অধিকাংশ ইঙ্গরেজ রাজপুরুষ যাহার পোষকতা করিতেছেন, যাহার উন্নতিকল্পে এক লক্ষ টাকারও অধিক সংগৃহীত হইয়াছে এবং যাহা 'ইঙ্গলিস্‌ম্যান' সংবাদপত্রের মতে "বিটিশ ভারতের ইতিহাসে একটি অভিনব যুগের সঞ্চার করিয়াছে," তাহা লর্ড লিটনকর্ত্তৃক লর্ড রিপনের রাজনীতির ব্যাখ্যা অনুসারে বুঝিতে হইবে। লর্ড রিপন স্বয়ং এরূপ স্পষ্ট কথা বলিতে সর্ব্বদা সাবধান থাকিতেন। যে সকল প্রস্তাবের ঘোরতর প্রতিবাদ উপস্থিত হইত, তৎসমুদায় যে, পরস্পর স্বতন্ত্র এবং অল্প প্রয়োজনীয়, একথা রিপনের বন্ধু ও পরিপোষকগণও বলিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। ইঙ্গলণ্ডের উদারনীতিক সম্প্রদায়ও লর্ড লাটনের পূর্ব্বোক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু অন্তরের সহিত করেন নাই। ইহারা আপনাদের প্রবর্ত্তিত নীতির মূলসূত্রের বিরুদ্ধে কোন কথা হইলে এই ভাবেই প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। লর্ড লীটন উদারনীতিক সম্প্রদায় ও লর্ড রিপনের পক্ষ হইয়া তাঁহাদের রাজনীতির যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উদারনীতিক সম্প্রদায় বিলাতে এবং লর্ড রিপন ভারতবর্ষে যে, আপনাদের জ্ঞাতসারে ঠিক তদনুসারে চলিয়াছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত

করা ভ্রমাত্মক। পক্ষান্তরে লর্ড রিপন সম্ভবতঃ প্রথমে তাঁহার প্রবর্ত্তিত নীতির অপরিহার্য্য প্রকৃতি যেমন জানিতেন না, তেমনই তিনি ঐ নীতির প্রবর্ত্তনায় যে তীব্র প্রতিবাদ ঘটিবে, তাহার জন্যও প্রস্তুত ছিলেন না। লর্ড রিপন যাহা করিয়াছেন, তাহার জন্যও তাঁহার যথোচিত প্রশংসা না করা অন্যায়। তাঁহার হস্তে দীর্ঘকালব্যাপী ও শ্রমসাধ্য একটি বিষয় সম্পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু তিনি উহা অপেক্ষা উন্নত বিষয়ের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অবলম্বিত নীতি, পূর্ব্ববর্ত্তী গবর্ণরজেনেরলগণ এমন কি লর্ড লীটন স্বয়ং যে রাজনৈতিক মূলতত্ত্ব পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতেছিলেন, সেই মূলতত্ত্বেরই পূর্ণবিকাশ মাত্র। কিন্তু লর্ড রিপন তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী গবর্ণরজেনেরলগণ অপেক্ষা অধিকতর একাগ্রতার সহিত কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় গবর্ণমেণ্টের কঙ্কালাবশিষ্ট নির্জীব দেহে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে এবং তাঁহার একাগ্রতায় প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টসকল তাঁহার অবলম্বিত নীতি কার্য্যে পরিণত করিতে উৎসাহযুক্ত হইয়াছেন। ইহাতে দেওয়ানী বিভাগে জাতিগত বৈষম্যের চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, স্থানীয় কর্ম্মচারীরা স্থানীয় শাসনপ্রথার প্রবর্ত্তনে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। রাজতন্ত্র শাসনপ্রণালীর স্বেচ্ছাচারিতা এখন ক্রমে প্রতিনিধিপ্রণালী ও নাগরিক স্বাধীনতায় পরিণত হইতেছে। ভারতের জনসাধারণের স্বাধীনতার পথ এখন ক্রমে সরল হইয়া আসিতেছে। যদিও এখন গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কোন রূপ হ্রাস হয় নাই, যদিও গবর্ণমেণ্ট রুশিয়ার সম্রাটের ন্যায় আপনাদের অসাধারণ ক্ষমতা পরিচালন করিতেছেন, যদিও ভারত গবর্ণমেণ্ট শাসনপ্রণালীতে এখন পর্য্যন্ত স্বেচ্ছাচারের পরাকাষ্ঠা

দেখা যাইতেছে, তথাপি যে প্রণালীতে ঐ ক্ষমতা পরিচালিত হয়, সেই প্রণালীর পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। রাজ্যবৃদ্ধি দ্বারা আপনার ক্ষমতা, সম্মান, অধিকারবৃদ্ধির সময় এখন অন্তর্হিত হইয়াছে। পররাজ্য-গ্রহণের কথা এখন আর শুনা যায় না। আফগানিস্তানে যে ভ্রমাত্মক নীতি অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অন্যায় আক্রমণ হইতে ঐ রাজ্য রক্ষা পাইয়াছে। মহীশূর রাজ্য ৫০ বৎসর কাল ব্রিটিশ শাসনাধীন রাখিয়া সম্প্রতি উহার বিধিসঙ্গত অধিপতির বংশের এক জন রাজকুমারের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। ভারতের ইতিহাসে এই প্রথমবার ব্রিটিশ অধিকারের লোহিত রেখার চিহ্ন অপসারিত হইয়াছে। নিজামের হস্তে বেরার প্রত্যর্পণের সম্ভাবনা আছে। বরদার শুইকুমার আপনার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। কলিকাতার প্রধান বিচারালয়ে একজন বাঙ্গালীকে কিছু দিনের জন্য প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

জাতীয় অহঙ্কার, স্বেচ্ছাচারমূলক সংস্কার, কেবল আত্মোন্নতিতে ব্যগ্র হিতৈষিতা—এগুলি এখন আর আমাদের ভারত রাজনীতির মূল ভিত্তি স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না, পূর্ব্বতন গবর্ণমেণ্টের এই গুলি নীতি ছিল "প্রজা সাধারণের ইচ্ছা ও মানসিক ভাবের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া সভ্যতার বিস্তার করা"। ইহাতে আইন ও কর এত দূর বৃদ্ধি পায় যে, পরিশেষে অভিনব করস্থাপন করা একটি রাজনৈতিক সমস্যা হইয়া উঠে। বিলাতের যে সকল শ্রমজীবী ভারতবর্ষ ও চীন দেশের বাজারের উপর নির্ভর করিয়া আসিতেছে, "যুদ্ধের

সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিবার” নীতি তাহাদের পক্ষে বড় ক্ষতিকারক। “বৈজ্ঞানিক সীমা স্থাপন করিবার” নীতির গুণে দুর্ভিক্ষনিবারণের জন্য যে অতিরিক্ত কর সংগৃহীত হইয়াছিল, তৎসমুদয় যুদ্ধবিগ্রহে নিঃশেষিত হইয়াছে। “ভারতবর্ষীয়দিগের প্রকৃতিগত নীতিজ্ঞানশূন্যতা” বিষয়ে আংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় কোন প্রমাণ না পাইলেও, উহা নিম্নশ্রেণীর সরকারী কর্ম্মচারী ও গ্রন্থকারগণ পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এখন ঐ সকল সঙ্কীর্ণ বিষয় অবজ্ঞাকূপে নিক্ষিপ্ত ও অতীত কালে বিলীন হইয়া গিয়াছে। সরকারী কর্ম্মচারিগণের মধ্যে এখন কেহ কেহ অভিজ্ঞতাপূর্ণ উদার রাজনীতির পরিচয় দিতেছেন এবং প্রশস্তভাবে রাজনৈতিক বিষয়ের মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতেছেন। অধিক দিন অতীত হয় নাই, কলিকাতা মিউনিসিপালিটির সভাপতি হারিসন্ সাহেব যে স্বাধীন ভাব ও সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আমরা তাঁহার সম্মাননা করিতেছি। আমাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, তাঁহার পদস্থ আর সকলেও তাঁহার ন্যায় সৎকার্য্য সাধন করিবেন*। পাইওনিয়র সংবাদপত্রে সম্প্রতি যে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা রাজস্বসচিব স্যার অক্‌লাণ্ড কল্‌বিনের লেখনী প্রসূত বলিয়া রাষ্ট্র হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে, গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারীদিগের মধ্যেও কেহ কেহ অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অথচ অনেকে

* এবিষয়ে মহামতি কটন সাহেব স্বয়ং যেরূপ সাহস ও স্বাধীনভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে আমাদেরও সেই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে।—অনুবাদক।

দীর্ঘকাল এদেশে বাস করিয়াও উহা বুঝিতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য যে, লর্ড রিপন এবিষয়টি যেমন সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, আর কেহই তেমন পারেন নাই।

রাজ্যশাসনের প্রাচীন নীতিসকল এখন অনাদৃত হইলেও যে পর্য্যন্ত তৎসমুদয়ের স্থলে অভিনব নীতিসকল প্রবর্ত্তিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত উহা সমূলে বিনষ্ট হইবে না। এখন এই কার্য্য করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সহজ নয়। ইঙ্গলণ্ডের মন্ত্রীসম্প্রদায় ও ইঙ্গলণ্ডের জনসাধারণ সহায় না হইলে উহা সম্পন্ন হইবে না। এইজন্যই আমি বলিতেছি যে, ইঙ্গলণ্ডের সাধারণ মতের এই একটি বিশেষ ক্ষমতা আছে যে, উহা গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করিতে পারে, উদ্দেশ্যসাধনে গবর্ণমেণ্টকে বলসম্পন্ন করিতে পারে এবং যখন আবশ্যক হয়, তখন গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত নীতি কার্য্যে পরিণত করিয়া তুলিতে পারে। ইঙ্গরেজ জাতির সাধারণ মত বিশেষ বিশেষ বিষয়ে প্রযোজিত হইলে যে, ফল পাওয়া যায়, তাহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, গবর্ণমেণ্টের মূলনীতির সংঘটনবিষয়ে উহা প্রযোজিত হইলে, অধিকতর ফল লাভ হইতে পারে। ইঙ্গলণ্ডের লোকে ভারতবর্ষের ন্যায় একটি বিস্তৃত রাজ্যশাসনে চেষ্টা করিলেই যে, তাহাদের কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ হইবে, তাহা নহে। যাঁহাদের ভারতবর্ষসংক্রান্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহাদের হস্তে শাসনসংক্রান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় থাকা উচিত। তাঁহাদের উপরেই পুনর্গঠন নীতি ফলবতী করিবার সম্বন্ধে সমস্ত দায়িত্বভার চিরকালই সমর্পিত আছে। আমাদের ভারতশাসনের অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁহারাই মঙ্গলকর ও মহৎ কার্য্যসম্পাদনে সমর্থ। বর্ত্তমান

আন্দোলন ও উত্তেজনার সময়ে যে সকল অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে, ভারতবর্ষের রাজকর্ম্মচারীদিগের সমবেত চেষ্টা ও সহকারিতায় তৎসমুদয় নিরাকৃত হইতে পারে। পদোচিত প্রভূত ক্ষমতাবলে, সহিষ্ণুতা, শিষ্টতা ও সদিচ্ছার দৃষ্টান্তে তাঁহারা আত্মগরিমা ও অহঙ্কার সংযত রাখিতে এবং ভারতবাসীদিগের সহিত সদয় ভাব স্থাপন করিতে পারেন। ইঙ্গলণ্ডের জনসাধারণের কর্ত্তব্য আর এক রূপ। তাহারা সর্ব্বদা বৈষয়িক কার্য্যে যেরূপ ব্যাপৃত থাকে, তাহাতে ভারতের শাসনকার্য্যের সূক্ষ্ম বিষয় তাহাদের জানিবার সম্ভাবনা নাই। তাহাদের স্বার্থ স্বদেশেরই অধিকতর নিকটবর্ত্তী। গবর্ণমেণ্ট যে সাধারণ নীতি অনুসারে পরিচালিত হইবেন, সেই নীতির উপরে তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা, যে সাধারণ মতের বলে স্থানীয় রাজকর্ম্মচারিগণ আপনাদের কার্য্যে উৎসাহযুক্ত ও দৃঢ়তাসম্পন্ন হইতে পারেন, সেই সাধারণ মত সংগঠনে চেষ্টা করাই তাহাদের প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত।

যাঁহারা আমার ন্যায় মতাবলম্বী, তাঁহাদের ঐরূপ সাহায্য দানে দোলায়মানচিত্ত হইবার প্রয়োজন নাই। আমাদের সন্দিগ্ধচিত্ত হওয়ার কোন কারণ দেখা যায় না। প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে আমরা সসজ্জ রহিয়াছি। আমাদের যেরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তাহাতে আমাদের বিবেচনায় যে নীতি অনুসৃত হওয়া উচিত, সেই নীতি সংগঠিত করা কঠিন নয়। আমরা আধুনিক সমাজ-জীবনের মূল সূত্র—রাজনীতির উপর ধর্ম্মনীতির প্রাধান্য—স্বীকার করিতেছি। ধর্ম্মনীতি দ্বারা আমাদের রাজনৈতিক কার্য্যের পরীক্ষা করিতে আমরা

উৎসুক হইয়াছি। যেমন প্রত্যেক লোকের সম্বন্ধে, তেমনই প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধে কাহার কি কর্ত্তব্য, তাহাই দেখিতে হইবে, কাহার কি স্বত্ব আছে, তাহা দেখিতে হইবে না। আমরা প্রাচীন নীতির স্থলে এই অভিনব নীতিরই নির্দ্দেশ করিতেছি। ইহাই পুনর্গঠনবিষয়ে আমাদের অবলম্বনীয় নীতি। এই নীতি ইঙ্গলণ্ডের কর্ত্তব্যজ্ঞান ও ভারতবর্ষের প্রযোজনের উপব সমভাবে সংস্থাপিত হইবে। এই নীতিই দুর্ব্বল ও নিপীড়িত জনসাধারণেব প্রতি প্রবল জাতির অনুরাগের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। ইহাই আমাদের সেই ভবিষ্যৎ নীতি। জাতীয় স্বার্থত্যাগ, স্বেচ্ছায় প্রত্যর্পণ, নিঃস্বার্থভাবে কোমল নীতির অনুসরণ, এই তিনটিই ঐ অভিনব নীতির অবশ্যম্ভাবী ফল।

শাসননীতির পুনর্গঠন।

ভারতে আমাদের অধিকার চিরস্থায়ী হইবে, এরূপ ধারণা বোধ হয় চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে অল্প লোকেরই আছে। যে দিন ইঙ্গরেজী শিক্ষাপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত ও রাজনৈতিক সমতার মূলসূত্র অনুমোদিত হইয়াছে, সেই দিনই ভারতের স্বাধীনতা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে*। উহা এখন কেবল সময়সাপেক্ষ।

সৌভাগ্যক্রমে উপস্থিত বিষয়ে আমাদের আত্মস্বার্থ ও আমাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধির মধ্যে কোন বিরোধ নাই। সাধারণত

* উপস্থিত বিষয়ের সমর্থন জন্য আমি সন্তোষসহকারে মাউন্টষ্টুয়ার্ট এলফিনষ্টোনের ন্যায় একজন প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞের অভিমত এইস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। বহু পূর্ব্বে ১৮৫০ অব্দে তাঁহার একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন:—"যে অল্প সংখ্যক বিদেশী পরিদর্শক ধর্ম্ম, মানসিক ধারণা এবং আচার ব্যবহারের বিভিন্নতা প্রযুক্ত পৃথকভাবে অবস্থিতি করেন, ঐ সকল কারণে জনসাধারণের সহিত যাঁহাদের ঘনিষ্ঠতা জন্মে না, তাঁহারা যে, চিরস্থায়ীরূপে কোন বৃহৎ দেশের সকল বিভাগের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, তাহা আমার বোধ হয় না। আমার বিশ্বাস যে, অন্য কোন আপত্তি না থাকিলেও ভারতবাসীদিগের মধ্যে শিক্ষার উন্নতি হওয়াতে ঐ কার্য্য অসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। জাতীয় ন্যায়পরতা ও জাতীয় সম্মানে জলাঞ্জলি দিয়া, ভারতবাসীদিগের মানসিক ভাব চাপিয়া রাখিয়া এবং জ্ঞানোন্নতিতে ভারতবাসীকে নিরুৎসাহ করিয়া, একদিন তাহাদিগকে নিকৃষ্ট অবস্থায় স্থাপিত করিতে পারা যাইত। কিন্তু এখন আমরা আমাদের সহিত সমকক্ষভাবে তাহাদের মানসিক গুণের উন্নতিসাধনে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতেছি। এই দেশে যে, শাসনপ্রণালী ও রাজনীতি দীর্ঘকাল প্রচলিত আছে, তৎসম্বন্ধে তাহাদের মনে উদার মত প্রবেশিত করিতেছি, এখন যে প্রণালী অজ্ঞ ও ক্রীতদাসদিগের শাসনের উপযোগী, সেই প্রণালীতে তাহাদিগকে শাসন করিবার চেষ্টা করা বৃথা।"

ভারতাধিকার হইতে ইঙ্গলণ্ডের লাভ যতদূর অনুমিত হয়, তদপেক্ষা উহা অনেক ন্যূন। অনেকেই ভারতে ইঙ্গরেজদিগের চাকরী করা "ভদ্রোচিত কার্য্য, আপাততঃ জীবিকানির্ব্বাহের উৎকৃষ্ট সংস্থান ও সম্মানজনক ব্যবসায় বলিয়া মনে করেন। এই কার্য্যে পূর্ণ যৌবনের প্রথমভাগ ভারতবর্ষে কাটাইয়া প্রৌঢ়ত্ব লাভের স্বল্পকাল পরেই উপযুক্ত রূপ ধনসঞ্চয় পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারা যায়। অন্ততঃ প্রৌঢ়াবস্থার পরবর্ত্তী বৃদ্ধাবস্থা স্বদেশে অতিবাহিত করা কাহারও পক্ষে অসম্ভব নহে।" কিন্তু এই হৃদয়াকর্ষক চিত্রের একটি অন্ধকারময় অংশ আছে। সম্মুখবর্ত্তী আস্তরণ পট উত্তোলিত করিয়া অন্তরালে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে, উদ্যম ও উৎসাহপূর্ণ, স্বাস্থ্যের জীবন্ত মূর্ত্তি ইঙ্গরেজ যুবক স্বদেশ—স্বজাতির নিকট হইতে বিদায় লইয়া প্রাচ্য গগনের প্রখর রশ্মির নিম্নে স্বেচ্ছাক্রমে অম্লানচিত্তে নির্ব্বাসিত হইতেছেন। তাঁহার যৌবন, তাঁহার (অকাল) বার্দ্ধক্য সামান্য অর্থে বিক্রীত হইতেছে। নিস্তেজকারী অসহনীয় জলবায়ুর মধ্যে তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইবে। যে পারিবারিক ধর্ম্মের ক্ষমতায় হৃদয়ের উচ্ছৃঙ্খলতা দূর হয়, অশান্ত চিত্ত শান্ত হয়, চরিত্র উন্নত হয়, তাহা হইতে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক বিচ্ছিন্ন করা হইয়া থাকে। যুবক স্ত্রীপুত্র ও বন্ধুবর্গ হইতে বিযুক্ত হইয়া পড়েন। তাঁহার সন্তানগণ ভারতে শিক্ষিত হইতে পারে না। মাতার সহিত তাহাদিগকে অতি শৈশবেই পিতার নিকট হইতে বিদায় লইতে হয়। কোন কোন সময়ে তাঁহাদের পারিবারিক বন্ধন চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কিন্তু অনেক সময়ে এই পারিবারিক

বিচ্ছেদ ইহা অপেক্ষাও অপকারিক ও অপকৃষ্ট আকার ধারণ করে। পুত্রকন্যার সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়, অথচ মাতা পিতার কেহই সন্তানগণের পালন ও শিক্ষার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন না। দুর্ভাগ্যক্রমে এই নিন্দনীয় প্রণালীই অনেক সময়ে পরিগৃহীত হয়। কিন্তু যখন ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রণালী অবলম্বিত হয়, যখন জননী কর্ত্তব্যকর্ম্মের সংগ্রাম ক্ষেত্রে স্বামীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বদেশে সন্তানপালনে নিয়োজিতা হন, তখনও সেই দীর্ঘব্যাপী অস্বাভাবিক বিচ্ছেদে গার্হস্থ্য জীবন ও পারিবারিক স্নেহবন্ধন নিদারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই পারিবারিক বিচ্ছেদ এবং তৎপ্রযুক্ত অশান্তি ও দুশ্চিন্তা আমাদের ভারতপ্রবাসের ভয়ঙ্কর সহচর। একজন ভারতে যাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন। কিন্তু অর্থ দ্বারা যাহা কিনিতে পারা যায় না, এমন বিষয়ে তাঁহাকে বঞ্চিত হইতে হয়। আপনার বৈষয়িক কার্য্যের অবসানে তিনি স্বদেশে ফিরিতে পারেন বটে, কিন্তু তখনও যদি তাঁহার কার্য্য করিবার শক্তি থাকে, তাহা হইলে সে শক্তি চালনার ক্ষেত্র পাওয়া যায় না। সুতরাং তাঁহার পরিপক্ক অভিজ্ঞতা বৃথা হইয়া যায় এবং তাঁহাকে অলস ও লক্ষ্য বিহীন অবস্থায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। বস্তুতঃ অধিকাংশ স্থলে তাঁহার স্বদেশের কার্য্যে ব্যাপৃত হওয়ার অনুরূপ শক্তি থাকে না। তাঁহার দেহ জীবনীশক্তি শূন্য হয়। বহুবৎসরের কঠোর পরিশ্রমে, তাঁহার হৃদয়ের তেজস্বিতা হ্রাস হইয়া যায়। এতকাল তিনি যে বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, সেই কার্য্যে তাঁহার মন সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। এখন তিনি সেই কার্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া,

এবং এতদিন যে বায়ুতে তাঁহার শ্বাসপ্রশ্বাস হইতেছিল, তাহা হইতে অন্তরিত হইয়া, তিনি অস্তিত্বমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া পড়েন।

ভারতপ্রবাসী ইঙ্গরেজের নিকট এই চিত্র অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হইবে না।

সত্য বটে, আমরা যত দিন ভারতবর্ষ আপনাদের অধীনে রাখিতে পারিব, ততদিন লোকবৃদ্ধি-জনিত অসুবিধা নিরাকরণের একটি উৎকৃষ্ট উপায় আমাদের আয়ত্ত থাকিবে। যেহেতু যে সকল মধ্যবিত ইঙ্গরেজ যুবক স্বদেশে অন্নের সংস্থান করিতে অসমর্থ, তাহারা ভারতে যাইয়া জীবিকানির্ব্বাহের উপায় করিতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে যত অনুকূল যুক্তিই থাকুক না কেন, ইহা অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, এই সকল লোক একটি অভিনব রাজ্য বা নূতন আশায় অনুপ্রাণিত, নূতনবিধ সুবিধাসম্বলিত একটি অভিনব সমাজসংগঠন এবং তৎপ্রযুক্ত আপনাদের উন্নতিসাধন করিবার জন্য ভারতে বাস করে না। ইহারা ভারতবর্ষে আইসে লাভের জন্য। আপনাদের মনোনীত কার্য্যে সাধ্যানুরূপ অর্থ সংগ্রহ করিয়াই ইহারা স্বদেশে প্রতিগমন করে। ভারতে ইহাদের প্রবাস অল্পকাল-স্থায়ী। এইরূপ নিয়ত গমনপ্রত্যাগমনে, প্রবাসীদিগের নৈতিক অবনতি না হইলেও ইঙ্গলণ্ডীয় সমাজের বিশৃঙ্খলা জন্মে। এই শেষোক্ত কুফলের সহিত তুলনায় ইহারা ভারত হইতে যে ধন আনয়ন করে, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। ভারতে ইহারা প্রবাসী, পরিব্রাজক। আপনাদের জন্মভূমিতে ইহারা অপরিচিত বিদেশী।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, ভারতের আধিপত্য পরিত্যাগ

করিলে আমাদের বিপুল ভারতবাণিজ্য রহিত হইবে। তদুত্তরে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের স্বাধীনতা ঘোষিত হওয়াতে মাতৃভূমির সহিত সে দেশের ব্যবসায়ের হ্রাস হয় নাই।

যদি বলাযায় যে, ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলে ইঙ্গলণ্ড ইউরোপীয় জাতির মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতা বলিয়া গণ্য হইবে। অধিকন্তু ভারতবর্ষ আমাদের সেনার রণ-কৌশল শিক্ষার ক্ষেত্র স্বরূপ, এজন্যও ভারতবর্ষ আমাদের অধিকারে রাখা আবশ্যক। ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, ইঙ্গলণ্ড ভারতবিজয়ের বহু পূর্ব্বেই প্রকৃত শক্তিসম্পন্ন ছিল। ক্রম্‌ওয়েলের নিজের দেশ চিরদিনই তাহার সন্তানগণের তেজস্বিতা ও পৌরুষে বলসম্পন্ন। আর এখনও যে, ইঙ্গলণ্ড পরাক্রান্ত, তাহা ভারতবর্ষ ইঙ্গলণ্ডের অধিকারে আছে বলিয়া নয়। ভারতবর্ষ ইঙ্গলণ্ডের স্কন্ধে একটি গুরুতর ভার স্বরূপ। ভারতাধিকারে ইঙ্গলণ্ডের শক্তি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। সেই শক্তি কেন্দ্রীভূত করিবার জন্য তথা হইতে আমাদের চলিয়া আইসা কর্ত্তব্য।

অপর দিকে ভারতাধিকার হইতে ইঙ্গলণ্ডকে যে, প্রভূত অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ভারতরক্ষা করিতে যাইয়াই, আমরা অনেক গোলোযোগের সূত্রপাত করিতেছি। ইউরোপের বাহিরে আমাদিগকে যত সঙ্কটে পড়িতে হয়, ভারতবর্ষই তাহার একমাত্র কারণ। প্রধান প্রধান প্রাচ্য জাতির সহিত আমাদের যে সকল বিবাদ হয়, তাহার মূল ভারতবর্ষ। ভারতের রাজস্বঘটিত

বিষয়ের জন্যই চীন দেশের সহিত আমরা সাতিশয় দূষিত ব্যবহার করিতেছি। এইরূপ ভারতবর্ষের জন্যই ইউরোপে আমাদের পররাষ্ট্রনীতি অধিকতর অনিষ্টকর হইয়া উঠিতেছে*। আমাদের দেশের রাজনীতির নেতারা আমাদিগকে এখন আর একটি মহাপরাক্রান্ত পাশ্চাত্য শক্তি না বলিয়া এশিয়ার একটি প্রধান শক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সঙ্কুচিত হন না। বহু শতাব্দীর শ্রম ও স্বতউদ্ভূত চেষ্টার ফলে ইউরোপীয় জাতির সহিত আমাদের একতা ঘটিয়াছে। সেই একতা পরিহার করিয়া, যে জাতি আমাদের অপেক্ষা হীনবল, যাহারা মহাদেশ, সাগরসমূহে আমাদিগহইতে বিচ্ছিন্ন এবং জল, বায়ু, ভাষা, ধর্ম্ম, রীতিনীতি, জাতীয় ইতিহাস প্রভৃতি সকল বিষয়ে আমাদের ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত, সেই প্রাচ্যজাতির সহিত সংস্রব

* ৮৭৯ অব্দে ১২ই মে টাইমস পত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে উপস্থিত বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে সাধারণ মত কিরূপ তাহা ঐ প্রবন্ধের নিম্নে দ্ধৃত অংশে পরিস্ফুট হইবে — ভারতাধিকারের সহিত ইঙ্গলণ্ডের সমস্ত পররাষ্ট্রনীতির যে অধিকতর সংস্রব আছে তাহার উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। মাল্টার (বোধ হয় জিব্রাল্টারেও) পূর্ব্বদিকে যাহা কিছু করা হয়, তাহাতেই ভারতবর্ষের সম্বন্ধ থাকে। এশিয়ামাইনর বা মিশরদেশ ভারতবর্ষের পথে বা পথের নিকটে অবস্থিত রহিয়াছে বলিয়াই আমরা উহার সংস্রবে আসিয়া থাকি। আর কিছু অগ্রসর হইলেই সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে রুশের সহিত ভারতবর্ষের সংস্রব হইতে পারে বলিয়াই, আমরা ভারতের দিকে রুশের অগ্রসর হওয়াতে ঈর্ষা প্রকাশ করি। ভারতে যে রাজনীতির বিস্তৃতভাব দেখাইয়াছি, তাহা সদুদ্দেশে কি অসদুদ্দেশে প্রবর্ত্তিত হইল, তাহা আমাদের দেখা উচিত। ভারতসাম্রাজ্যরক্ষার্থ অবিশ্রান্ত কষ্ট স্বীকার করাই যদি আমাদের কর্ত্তব্য হয় তাহা হইলে যে, উহা থাকায় আমাদের সুবিধা আছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া উচিত। *** এখন বোধ হয়, ভারতের শাসন কার্য্য সম্পাদনার্থ অভিনব প্রণালী প্রবর্ত্তনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। উহা যে আবশ্যক ও সম্ভবপর, তাহা অনেক গুলি ঘটনা সমভবে প্রতিপন্ন করিতেছে।”

আসিতে ইঁহারা আমাদিগকে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। যত দিন এই নীতি প্রবল থাকিবে, ততদিন আমাদের স্বদেশের স্বার্থের সমূহ ক্ষতি হইবে। স্বদেশে আমরা যে, নানা প্রকার স্বার্থসূত্রে জড়িত রহিয়াছি, তাহা পর্য্যাপ্ত বোধ না হওয়াতেই যেন বিদেশে নানাবিধ স্বার্থের কল্পনা করিতেছি। আমরা স্বদেশে যে সকল শাসনসংক্রান্ত কার্য্যের সম্পাদনে কৃতসঙ্কল্প রহিয়াছি, তাহাই সম্পন্ন কবিয়া উঠিতে পারিতেছি না। পার্লিয়ামেণ্ট মহা-সভার কার্য্য ক্রমেই জমিয়া যাইতেছে। ইঙ্গলণ্ডে কৃষকদিগের অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা আছে। শ্রমজীবীদিগের সহিত মূলধনীদিগের সম্বন্ধও পরিবর্ত্তনযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন সামন্ত-প্রথা ও কাথলিক ধর্ম্মের শেষ চিহ্ন দিন দিন অন্তর্হিত হইতেছে। লোকে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেছে। অথচ ঐ সকল প্রাচীন প্রথার স্থানপূরণের কোন চেষ্টা হইতেছে না। আমাদের পরিবর্দ্ধনশীল মহানগর সমূহের সহস্র সহস্র অধিবাসীর অশেষ যাতনা যেন, নীরবে ইঙ্গরেজের প্রবল রাজ্যলিপ্সা ও প্রভুত্ব-পিপাসার বিরুদ্ধে ইঙ্গলণ্ডের নিকটে অভিযোগ করিতেছে।

যে মুখ্য কর্ত্তব্যের উপর আমাদের স্বদেশের সুখসৌভাগ্য নির্ভর করিতেছে, তাহাতে উদাসীন না হইলে আর আমরা পররাষ্ট্রগ্রহণনীতির অনুসরণ করিতে পারি না। আমাদের কর্ত্তব্যের সহিত স্বার্থের সামঞ্জস্য আছে। আর আমরা কাল হরণ করিতে পারি না। আমরা ভারতবর্ষ একবার পাইয়াছি বলিয়াই, যে পর্য্যন্ত উহা হস্তান্তরিত না হয়, সে পর্য্যন্ত উহা ধরিয়া বসিয়া থাকিব, এইরূপ অন্ধসঙ্কল্পের বশবর্ত্তী হইয়া

আর আমরা ভারতবর্ষ লইয়া থাকিতে পারি না। "ভারতের সুশাসন ও স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া এবং ইউরোপীয়দিগের ধনপ্রাণ রক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া, যত শীঘ্র সম্ভব, ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করা বিধেয়", * কর্ত্তব্য বুদ্ধি ও স্বার্থ উভয়েই এক বাক্যে এই কথা বলিতেছে।

হঠকারীর ন্যায় কাজ করা আমার মতে অনুচিত। আমার মতে বিশেষ বিবেচনা না করিয়া তাড়াতাড়ি কিছুই করা কর্ত্তব্য নহে। আমি গবর্ণমেণ্টের একজন প্রভুভক্ত ক্ষুদ্র কর্ম্মচারী। আমি যে রাজকীয় কার্য্যে ব্রতী আছি, তাহার দায়িত্ব উত্তম রূপে বুঝি। আমার মতসম্বন্ধে কাহারও ভ্রমাত্মক বিশ্বাস না জন্মে, সে বিষয়ে আমি বিশেষ সতর্ক। ভারতবর্ষ ইঙ্গলণ্ডকর্ত্তৃক যেরূপে পরিরক্ষিত হইতেছে, তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর নাই। ভারতের নিমিত্ত ইঙ্গলণ্ডকে অনেক রূপে দায়গ্রস্ত হইতে হইয়াছে। সে সকল হইতে সহজে মুক্ত হওয়া সম্ভব নহে। বোধ হয়, কেহই সহসা ভারত পরিত্যাগ করিতে বলিবেন না। ভারতের পক্ষে অতীত কালের প্রথা পরিত্যাগ করা যেরূপ অসম্ভব, ইঙ্গলণ্ডের পক্ষেও অতীত কালকে বিস্মৃত হওয়া তেমনি অসম্ভব। কেহ যদি একটি শিশুকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায় এবং পরে নিজের দুষ্কার্য্য স্মরণ করিয়া, অনুতপ্তহৃদয়ে ব্যাঘ্রের আবাসভূমি কোন অরণ্যে সহসা তাহাকে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহার কার্য্যে যেরূপ হয়, আমরা যদি ভারত-রক্ষার সুবন্দোবস্ত না করিয়া

* এই স্থলে ও অন্যান্য স্থলে আমি যে ভাষা প্রযোগ করিয়াছি তাহার আভাস ডাক্তর কনগ্রিবের ভারতবর্ষশীর্ষক প্রস্তাব হইতে গৃহীত হইয়াছে।

সহসা চলিয়া যাই, আমাদের কার্য্যও সেইরূপ হইবে। লর্ড রিপনের কার্য্যের বিরুদ্ধে যে নিতান্ত শোচনীয় আন্দোলন হইয়া গিয়াছে, তাহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করা সহজ নহে। ইহা ধীরে ধীরে কোমলভাবে করিতে হইবে। শাসন-নীতির পুনর্গঠন এক দিনের কার্য্য নহে। ইহা ধীরে ধীরে এবং ক্রমে ক্রমে সম্পন্ন করিতে হইবে। আমি যে নীতির সমর্থন করিতেছি, তাহা কার্য্যে পরিণত হওয়ার পূর্ব্বে বহু বৎসর ও বহুপুরুষ চলিয়া যাইবে। কিন্তু এই নীতিই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমরা এই উদ্দেশ্যেই নিরন্তর যত্ন ও চেষ্টা করিব। শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, ভারত প্রাচ্যজাতির মধ্যে আপনার প্রাচীন গৌরবান্বিত আসন পরিগ্রহ করিবে। যাহাতে ভারতভূমি ক্রমে ক্রমে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতে পারে, আমরা কার্য্যতঃ তাহারই সহায়তা কবিব। কেবল মুখে বলিলে চলিবে না। ভারত গবর্ণমেণ্ট যাহাতে সকল প্রকার দায় হইতে শান্তভাবে মুক্ত হইয়া দেশের শাসনভার ভারতবর্ষীয়দিগের হস্তে সমর্পণ করিতে পারেন, তাহাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

এই কার্য্য প্রথমে যতদূর কঠিন বলিয়া অনুমিত হয়, বস্তুতঃ উহা তত কঠিন নহে। বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন যত কঠিন কার্য্য, এক এক রাজ্যের সুশাসনের বন্দোবস্ত করা, তত কঠিন নহে। উক্ত রূপ সদ্ভাবস্থাপনও যত দুরূহ বলিয়া বর্ণিত হয়, বাস্তবিক তত দুরূহ নহে। ইঙ্গরেজ নিজ ভয়ঙ্কর নীতির বলে ভারতবর্ষকে চাপিয়া রাখিতেছেন। ভারতে

শাসননীতির পুনর্গঠনে তাঁহারা অসমর্থ, ইহা স্বীকার করা তাঁহাদের পক্ষে শোভা পায় না।

উপস্থিত বিষয়ে যে প্রণালী অবলম্বন করা উচিত, তৎসম্বন্ধে কয়েকটি স্থূল স্থূল বিষয়ের উল্লেখ করিব। সাধারণতঃ বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয় যে, ভারতবর্ষকে ইঙ্গলণ্ডের একটি উপনিবেশ বলিয়া গণ্য করিয়া, ইঙ্গলণ্ডের সহিত উহার ভ্রাতৃভাব স্থাপন করিলেই উপস্থিত বিষয়ের সুন্দর মীমাংসা হয়। ভারতবর্ষ ও ইঙ্গলণ্ডের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করিলে অর্থাৎ ইঙ্গলণ্ড প্রধান দেশ এবং ভারতবর্ষ উহার উপনিবেশস্থানীয় হইলে যে, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের অধিপতিগণ শান্তভাব অবলম্বন করিবেন, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করা যায়। ভারতবর্ষে ইঙ্গরেজের সর্ব্বদা স্বার্থ থাকিবে। এই স্বার্থপ্রযুক্ত ইঙ্গরেজ সুশাসনের জন্য ভারতের শাসনকার্য্যে আবশ্যক মত হস্তার্পণ করিতে পারিবেন। যদি কখনও ভারতে আত্মবিগ্রহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ইঙ্গলণ্ড উভয় দেশের স্বার্থরক্ষার জন্য সৈন্যবলে উহার দমন করিবেন। ইঙ্গলণ্ডই ভারতে শান্তিরক্ষার জন্য প্রধানত দায়ী থাকিবেন।

যে পর্য্যন্ত ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে সেনা সজ্জিত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত ভারতে ব্রিটিশ সেনা রাখিতেই হইবে। কিন্তু ভারতীয় সৈন্যের সংগঠনপ্রণালী উপযুক্তরূপ পরিবর্ত্তিত করিলে ব্রিটিশ সেনার সংখ্যা কমান যাইতে পারে। বিজিত দেশশাসনের দুইটি মাত্র উপায় আছে। হয় পরাজিত জাতিকে সম্পূর্ণরূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা, না হয় তাহাদিগকে আপনাদের সমকক্ষ জ্ঞান করিয়া কার্য্য করা। আমরা ভারতবর্ষীয়দিগকে

ক্রমেই সকল বিষয়ে আমাদের সমকক্ষ করিয়া তুলিতেছি। এখন, কি সৈনিকবিভাগ কি দেওয়ানীবিভাগ, গবর্ণমেণ্টে সকল বিভাগেরই সংস্কারকালে, যাহাতে গবর্ণমেণ্টের স্বার্থ ও ব্যক্তিগত স্বার্থ এক হয়, তাহারই উপায় করিতে হইবে। ভারতবর্ষে এখন অর্থের জন্যই লোকে সৈনিক-শ্রেণীতে নিবিষ্ট হয়। আমাদের সীমান্তপ্রদেশে বা তদ্বহিঃস্থিত অসভ্য বর্ব্বর জাতি হইতে সৈন্য সংগৃহীত হইয়া থাকে। এ দিকে আমাদের ভারতীয় প্রজাগণের শৌর্য্যবীর্য্য ক্রমে কমিয়া যাইতেছে। স্যার রিচার্ড টেম্পল "কণ্টেম্পোরারি রিবিউ" নামক সাময়িক পত্রে লিখিয়াছেন যে, "৫০ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল জাতি শস্ত্র-চালনায় নিতান্ত অনুরক্ত ছিল, আজ তাহাদের আর সেরূপ পরাক্রম নাই। শিক্ষিত হইলে ভারতীয় সৈন্য এখনও রণদক্ষতা দেখাইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে লোকের আর পূর্ব্বের ন্যায় সমরবাসনা এবং মল্লযুদ্ধে সেইরূপ আসক্তি দেখা যায় না।" মোগল সম্রাটগণ ভারতবাসীদিগকে হৃদয়ের সহিত সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতেন। আকবরের পিতামহ যাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই সন্তানগণ আকবরের প্রধানতম সেনানায়ক ও প্রধানতম সহায় হইয়া উঠিয়াছিলেন। বীরত্বসম্পন্ন রাজপুতেরাই মোগলের সিংহাসন-রক্ষার প্রধান স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। পক্ষান্তরে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট, সন্দেহের নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। সামান্য সৈনিকগণই বৃদ্ধ হইলে আমাদের সামন্ত-শ্রেণীতে নিবেশিত হইয়া থাকে। দীর্ঘকাল কার্য্য করাতে তাহারা অধিক বেতন পায়, এবং নিম্নপদস্থ ব্রিটিশ সেনার সহিত একত্র উপবেশন করিতে

পারে। এরূপ লোকের নিকট হইতে আমরা বিশেষ সহায়তার আশা করিতে পারি না। সহায়তাও কখনও প্রাপ্ত হই না। রুশিয়া মধ্যএশিয়াতে যে সকল জনপদ অধিকার করিয়াছেন, তৎসমুদয় হইতে এক জন আলিখানফ্ বা একজন লরিস্ মেলিককফের ন্যায় সেনাপতি প্রাপ্ত হইতে পারেন। আমরা কেবল নায়ক, হাবিলদার বা রসলদার অথবা অন্য কোন নিম্নপদের লোক মাত্র দেখাইতে পারি। ইঙ্গলণ্ডের জনসাধারণ এই সকল নামের অর্থ কিছুই বুঝিতে পারে না। ভারতবর্ষীয় সেনার সংস্কার করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে তাহাদের বেতন ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে হইবে, তাহাদের কার্য্যদক্ষতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিকাশের পথ করিয়া দিতে হইবে এবং তাহাদিগকে আমাদের সমকক্ষ করিয়া তুলিতে হইবে। এরূপ হইলে ভারতের সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী ও ভদ্র লোকগণ আমাদের সৈনিকশ্রেণীতে নিবিষ্ট হইতে পারিবেন। ইহাতে তাঁহারা অর্থলোলুপ সেনার পরিবর্ত্তে বিশাল জাতীয় সৈনিকদলে পরিণত হইয়া উঠিবেন। এই নীতির সঙ্গে সঙ্গে স্বতন্ত্রীকরণপ্রণালী অনুসারে ভারতীয় সেনা বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা আবশ্যক হইবে। দেওয়ানী বিভাগে এই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। এই প্রণালীতে সমগ্র ভারত কানাডা এবং ইউনাইটেষ্টেট্‌সের ন্যায় পরস্পর একতাসূত্রে সম্বদ্ধ কতকগুলি প্রদেশীয় রাজ্য দ্বারা শাসিত হইবে। প্রদেশীয় কর স্থাপিত হইলেই প্রদেশীয় প্রতিনিধি-শাসন-প্রণালী-স্থাপন আবশ্যক হইবে। তাহা হইলে ক্রমে প্রত্যেক প্রদেশের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ পরিপুষ্ট

ও নির্দ্ধারিত হইতে থাকিবে। জনসাধারণ হইতে লোক নির্ব্বাচিত হইয়া, প্রদেশীয় সৈন্যদল সংগঠিত হইবে। এই সৈনিকগণের আপন আপন দলের মধ্যে একতার আবির্ভাব হইবে, মমতা জন্মিবে এবং ক্রমে প্রত্যেক দলের কীর্ত্তিকাহিনী সেই সেই দলের সৈন্যগণের গৌরবের বস্তু ও উৎসাহের হেতু হইয়া উঠিবে। এই সকল সৈন্য যে প্রদেশে কার্য্য করিবে, সেই প্রদেশের ভদ্র লোকগণ ইহাদের অধিনায়ক হইবেন। প্রদেশীয় সেনা এইরূপে গঠিত হইলে তাহারা ভারতের গৃহবিচ্ছেদনিবারণে ও বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণনিরোধে সম্পূর্ণ সক্ষম হইবে। মোগল সম্রাটগণের সময়ে রাজপুত ও মুসলমানগণ আপনাদের জাতীয় অধিনায়কদিগের অধীনে বিভিন্ন সেনাদলে বিভক্ত হইয়া বীরত্বের প্রতিযোগিতায় যেরূপ শৌর্য্য ও সাহস দেখাইত, তাহা আজ পর্য্যন্ত ইতিহাস পাঠকের স্মৃতিপথে জাগরূক রহিয়াছে। ভবিষ্য কালের প্রদেশীয় সৈন্যদলও সেইরূপ প্রতিযোগিতায় উত্তেজিত হইয়া সাধারণ স্বার্থের জন্য সংগ্রামে সেইরূপ শূরত্ব ও সেই রূপ সাহসের পরিচয় দিবে। ভারতবর্ষীয়েরা সখের সৈনিকদলে প্রবেশাধিকার চাহিতেছেন। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে ব্রিটিশ সেনা ও বেতনভোগী ভারতীয় সেনা ক্রমে কমান যাইতে পারে। ভারতের কেবল শিক্ষিত সম্প্রদায় এই সখের সৈনিকদলের জন্য আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন। হৃদয়ের অতি উচ্চভাবে পরিচালিত হইয়া, তাঁহারা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন যে, যখন তাঁহারা স্বদেশের শাসনকার্য্যের অপেক্ষাকৃত অধিক ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন,

যখন তাঁহারা স্বাধীন প্রজার ন্যায় স্ব স্ব অধিকার প্রার্থনা করিতেছেন, তখন তাঁহাদের পক্ষে দেশরক্ষার ভার গ্রহণে কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু এই ভাবের সহিত আরও অনেক মহৎ ভাব জড়িত রহিয়াছে। ভারতবর্ষীয়দিগকে সখের সৈনিক দলে গ্রহণ করা উচিত কি না, তদ্বিষয়ে যে প্রস্তাব-লেখকের কথা আমি স্থানান্তরে উদ্ধৃত করিয়াছি, তিনি বলেন :—

"সখের সৈনিকদলভুক্ত হওয়ার ইচ্ছার মূলে এই কয়টি কারণ রহিয়াছে:—(১) রাজনৈতিক সমতা স্থাপনের ইচ্ছা, এক শ্রেণীর লোক প্রভুত্ব করিবে, অপর শ্রেণী দাস বলিয়া গণ্য হইবে, এই অসমতা দূরীকরণের ইচ্ছা, (২) যাঁহারা দেশের রাজনৈতিক স্বত্বাধিকারসম্বন্ধে স্বাধীন প্রজার ন্যায় পরিগৃহীত হইতে চাহেন, যাহারা মোটা মাহিনার গবর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্ম্ম গ্রহণে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের রাজ্যরক্ষার ভার গ্রহণ করা উচিত, এই বিশ্বাস, (৩) বাঙ্গালী ও অন্যান্য ভারতীয় জাতির শারীরিক হীনতা অত্যন্ত শোচনীয়, এই শারীরিক হীনতা যাহাতে দূর হয়, তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবার ইচ্ছা, (৪) মহারাজ্ঞীর বিপুল সাম্রাজ্যের রক্ষক হইয়া যশ লাভের ইচ্ছা, (৫) ভারতে উন্নতিবিধায়ক ইঙ্গরেজ ও অবনতিবিধায়ক রুশের মধ্যে বিবাদ অবশ্যম্ভাবী, এই বিশ্বাস এবং সেই বিবাদে ইঙ্গরেজের পক্ষ অবলম্বন করিলেই ভারতবর্ষের কল্যাণ হইবে, এই ধারণায় নিঃসন্দিগ্ধভাবে সমবেদনাপ্রকাশের ইচ্ছা।"

শিক্ষিত সম্প্রদায় এ বিষয়ে যেরূপ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অতি বিচিত্র। ভারতীয় সংবাদ পত্রসকলও একবাক্যে

ও উৎসাহের সহিত ইঁহাদের সহিত উপস্থিত আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন। আন্দোলনকারিগণ যেরূপ উৎসাহ দেখাইয়াছেন, যদি সেই রূপ ধৈর্য্য ও স্থিরতা দেখাইতে পারেন, তাঁহা হইলে এই আন্দোলনে আমাদের সেনার ভবিষ্যৎ গঠন-প্রণালী অনেক পরিবর্ত্তিত হইবে এবং দেশের সামরিক ভাব জীবন্ত ভাবে থাকিবে।

অতএব দেশের শাসন-প্রণালীর পুনর্গঠন এই রূপে, করিতে হইবে। ভারতবর্ষকেই ইঙ্গলণ্ডের উপনিবেশ জ্ঞান করিয়া পরস্পর একতাসম্বদ্ধ কতকগুলি প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্ট দ্বারা শাসনকার্য্য চালাইতে হইবে, এবং ক্রমে বেতন-ভোগী স্থায়ী ব্রিটিশ সেনার স্থলে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে জাতীয় সেনা সংগঠিত করিতে হইবে। যে সকল সামাজিক প্রথা এখন বর্ত্তমান আছে, তাহা সাবধানে রক্ষা করিতে হইবে। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে যে সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হইতেছে, তজ্জন্য দেশ এখনও প্রস্তুত হয় নাই। এখনও দেশের বর্ণগত প্রাধান্য ও নেতৃত্বের সম্যক্ আবশ্যকতা রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের ফলে যে, উচ্চ বর্ণের প্রভুত্ব বিনষ্ট হইয়া সমাজের সকল শ্রেণীর পার্থক্য দূরীভূত হইতেছে, তাহা সকল দিকেই কুফল উৎপাদন করিতেছে। যে বিদেশীয় সেনায় দেশ নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িতেছে, এখন তাহা দূর করিয়া এক এক জন দেশীয় রাজার অধীনে এক একটি রাজ্য স্থাপন করা কর্ত্তব্য। এই সকল রাজা ও নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবী লোকের মধ্যে এক দল ঐশ্বর্য্যশালী ক্ষমতাপন্ন লোক থাকা আবশ্যক। এইরূপ ব্যবস্থা এদেশের সম্পূর্ণ উপযোগী। ইঙ্গলণ্ডের পূর্ব্বোক্ত

ঔপনিবেশিক প্রাধান্য ভিন্ন আরও কোন প্রকার রাজনৈতিক বন্ধনদ্বারা ভারতের প্রস্তাবিত একীভূত খণ্ড-রাজ্যসকল পরস্পর দৃঢ়বদ্ধ রাখিতে হইবে। নিম্ন শ্রেণীর লোকের উপরে একদল ক্ষমতাপন্ন ধনী সম্প্রদায় থাকা নিতান্ত আবশ্যক। ঐ শ্রেণীর লোকের অজ্ঞতা, নিরীহ প্রকৃতি, এবং দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত একদল ক্ষমতাপন্ন উচ্চ শ্রেণীর লোকের প্রয়োজন রহিয়াছে। অতএব প্রাচীন কাল হইতে যাঁহারা সমাজ পরিচালন ও শাসন করিয়া আসিয়াছেন, এরূপ এক দল শক্তিসম্পন্ন অভিজাত সম্প্রদায় দেশের সমাজের মূলভিত্তি স্বরূপ থাকিবেন। হিন্দুদের সহিত দীর্ঘকাল একত্র বাসপ্রযুক্ত মুসলমানেরাও বর্ণভেদের প্রভাব অনুভব করেন। সুতরাং মুসলমান ও হিন্দু, উভয় সম্প্রদায়ই উক্ত সম্প্রদায়কর্ত্তৃক শাসিত হওয়ার সম্পূর্ণ যোগ্য। হিন্দু এবং মুসলমানদিগের ধর্ম্মবিষয়ক অনৈক্য কোনরূপে ঐ প্রকার শাসন-প্রণালী স্থাপনের অন্তরায় হইবে না। ধর্ম্মবিষয়ক অনৈক্য অবশ্য সকল প্রকার শাসন-প্রণালীর পুনর্গঠনের প্রতিকূল। কিন্তু আমার স্মরণ আছে যে, আকবর ও হায়দর আলির প্রধান কর্ম্মচারিগণ হিন্দু ছিলেন। রণজিৎ সিংহের সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যদক্ষ মন্ত্রী মুসলমান। এই মন্ত্রীর ক্ষমতায় তাঁহার রাজনীতি নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে রেখামাত্রও বিচলিত হইত না। এই সকল দৃষ্টান্তে আশা হয় যে, কোন এক দিন হিন্দু ও মুসলান-সম্প্রদায়ের ভূপতি ও প্রধান লোকের মধ্যে একতা স্থাপিত হইতে পারে। কিন্তু অপর দিকে হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে যে, সর্ব্বদা বিদ্বেষভাব আছে, তাহা বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব। ব্রিটিশ-শাসনেও মুসলমান ও হিন্দুগণ যে, নানা স্থানে

পরস্পরের প্রতি ধর্ম্মগত বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে, কালী ও কৃষ্ণের উপাসকদিগের প্রতি গোঁড়া মুসলমানগণের যে, সমবেদনার অভাব আছে, তাহা আমি বেশ জানি। সুতরাং ইহাদের একের অধীনে অন্য সম্প্রদায়ের পরিচালকগণের বাস করা যে, একরূপ অসম্ভব, তাহা সহজেই বুঝাযায়। উভয় দলের সম্পূর্ণ সংমিশ্রণ আমি কখনই সম্ভবপর মনে করি না। সমভাবে সমবেদনা দেখাইয়া উভয় দলের পরিচালন করিতে পারেন, এরূপ লোক পাওয়াও সম্ভব নহে। বস্তুতঃ উভয় দলের পরিচালকগণ যেন পরস্পরের সম্মতিক্রমে পরস্পর হইতে অনেক দূরে পৃথক হইয়া পড়িয়াছেন। ভারতের অনেক স্থলে মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায় এ ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন যে, তাঁহাদের সহিত তদীয় হিন্দু প্রতিদ্বন্দ্বিগণের সংঘর্ষণের সম্ভাবনা নাই। হিন্দু ও মুসলমানগণ এইরূপ বিভিন্ন স্থানে বাস করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করা উচিত। সৌভাগ্যক্রমে এইরূপ বিভাগের সঙ্গে নিম্ন শ্রেণীর লোকের কোন সম্বন্ধ নাই। দেশের অধিকাংশ লোকের পক্ষে এরূপ সংমিশ্রণ তত কঠিন নহে। বঙ্গদেশবাসিগণ, কি হিন্দু কি মুসলমান, সকলেই অতি নিরীহপ্রকৃতি। এই প্রদেশে বহুদিনের সংস্রব ও একত্র বাসপ্রযুক্ত মুসলমান ও হিন্দুগণের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বঙ্গের সাগরসান্নিহিত ভাগে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। ভাষায়, রীতিনীতিতে ও ব্যবসায়ে দেশের প্রাচীন অধিবাসিগণের সঙ্গে ইহাদের কোন প্রভেদ নাই। এই প্রদেশে হিন্দু ও মুসলমানগণের সম্মিলন তত কঠিন নহে। কিন্তু ভারতের অন্য অংশে মুসলমানদিগের রাজত্বকালে মুসলমানগণ যেরূপ দেশের

প্রধান সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য হইতেন, এখনও সেইরূপ হইতেছেন। অদৃষ্টক্রমে একস্থানে বাস করিলেও মুসলমানগণ গোঁড়ামি প্রযুক্ত এখনও বিধর্ম্মীদিগের সহিত সম্মিলিত হন না। এই সকল লোক ও হিন্দুসম্প্রদায়ের পরিচালকদিগের মধ্যে কেবল যে, সমবেদনার অভাব আছে তাহা নহে, ইহাদের মধ্যে বৈরভাবও বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং ইহাদের পরস্পর সংমিশ্রণ অসম্ভব। তবে সুদূর ভবিষ্যতে, একবিধ ধর্ম্মবিশ্বাস ও একবিধ উদ্দেশ্যের প্রভাবে, এই দুই সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান বিষয়ের পার্থক্য দূর হইলেও হইতে পারে।

ফিরিঙ্গিগণ এবং যে সকল ইউরোপীয় ভারতবর্ষে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেও ঐরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঐরূপ করা অধিকতর সহজ। ইউরোপীয়েরা ভারতবর্ষীয়দিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করে, ফিরিঙ্গিগণ তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকে। এই অনুকরণ অনেক স্থলে অশান্তির কারণ হইতেছে, যেহেতু ভারতবাসিগণ ইহাদের সামাজিক প্রাধান্য কোনও রূপে স্বীকার করিতে চাহে না। ইঙ্গরেজদিগের সহিত ভাষা ও রক্তের সম্বন্ধ থাকাতে ইহারা সমাজে প্রধান বলিয়া গণ্য হইতে চায়, কিন্তু এদিকে ভারতবর্ষীয়দিগের সহিত রক্তের সম্বন্ধ আছে বলিয়া, ইউরোপীয়গণ ইহাদিগের সহিত মিশিতে চাহে না। এইরূপে ফিরিঙ্গিগণ উভয় সমাজকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইতেছে। যদি ইঙ্গলণ্ড ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে ইহাদের দশা সম্ভবতঃ মুসলমানগণের দশার অনুরূপ হইবে। কিন্তু আমাদের ভরসা আছে যে ইঙ্গলণ্ড কখনও ভারতের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবেন না। এ অবস্থায় উপযুক্ত স্থানে ইউ-

রোপীয় ও ফিরিঙ্গিগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিবেশস্থাপনই তাহাদের পক্ষে মঙ্গলকর ব্যবস্থা। এই সকল উপনিবেশ জর্ম্মণির স্বাধীন নগর কিংবা বেনিস ও জেনোবার সাধারণতন্ত্র নগরসমূহের অনুরূপ হইবে। যে সকল ইউরোপীয় এ দেশে থাকিতে ইচ্ছা করিবে, তাহারা ঐ সকল উপনিবেশে যাইয়া বাস করিবে। কার্য্যতঃ এইরূপ উপনিবেশ এখনই নানা স্থানে গঠিত হইতেছে। অনেক নগরে এক একটি "সাহেবপাড়া" আছে। এই সকল পাড়ার মিউনিসিপালিটির কার্য্য লইয়া ভারতবর্ষীয় ও ভারত প্রবাসী ইঙ্গরেজদিগের মধ্যে সর্ব্বদাই মনোবাদ উপস্থিত হয়। বাসস্থান ও রাজনৈতিক অধিকারের সম্পূর্ণ পার্থক্য বিধান না করিলে, ইহাদিগের মধ্যে সর্ব্বদাই বিবাদ বিসংবাদ ঘটিবে এবং রাজনৈতিক সঙ্কটে অনেক বিপদ উপস্থিত হইবে। যদি ভারতবর্ষীয়দিগের অত্যাচার হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ভারতে ইঙ্গলণ্ডের যে প্রভুত্ব থাকিবে, সেই প্রভুত্বই ইহাদের রক্ষার হেতুভূত হইবেক। কিন্তু ভারতবর্ষীয়দিগের আক্রমণ হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করার কখনও কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইবে না। উপস্থিত বিষয়ে অন্যান্য পরামর্শের জন্য আমার এক জন বাঙ্গালি বন্ধুর নিকট আমি ঋণী আছি। এই বন্ধু বিলক্ষণ সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত বলেন যে, ভারতপ্রবাসী ইঙ্গরেজগণ সময়ে সময়ে ভারতবর্ষীয়দিগের শত্রুতার উল্লেখ করিয়া যে সন্ত্রাসের চিহ্ন প্রকাশ করেন, ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক বৈরভাবই তাহার মূল কারণ। ভারতবর্ষীয়দিগের বিচারশক্তি ও বিবেচনা কম হইতে পারে, তাহারা ইঙ্গরেজের সঙ্গে

মিশিতে কুণ্ঠিত হইতে পারে, কিন্তু তাহারা কখনও গায় পড়িয়া অত্যাচার করে না। ইঙ্গলণ্ডবাসী ইঙ্গরেজদিগের সমবেদনার আবির্ভাব হইবে, এবং ঐ সকল ইঙ্গরেজের সহায়তায় অত্যাচারের পথ পরিষ্কৃত হইয়া আসিবে, এই উদ্দেশ্যেই ভারত-প্রবাসী ইঙ্গরেজেরা নিরীহ ভাব ও আত্মরক্ষার ভাণ করিয়া সন্ত্রস্তভাবে কোলাহল করিয়া থাকেন। ইঙ্গলণ্ড ভারতবর্ষ হইতে আপনাদের সৈন্যদল অপসারিত করিলেও ভারতপ্রবাসী ইঙ্গরেজদিগের কোন ক্ষতি হইবে না। যে হেতু ঐ সকল ইঙ্গরেজ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রণালীর অধীনে থাকিলে আপনাদের স্বার্থের জন্যই ভারতবর্ষীয়দিগের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিতে বাধ্য হইবে।

আমি এখন বিদেশী অধিপতিগণকর্ত্তৃক আক্রমণসম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। এশিয়ার অধিপতিগণ হইতে এরূপ আক্রমণের কোন আশঙ্কা নাই। বোধ হয়, সকলেই এ বিষয়ে আমার সহিত একমত হইবেন। যদি কখন এরূপ আক্রমণ ঘটে, তাহা হইলে, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য ও স্বাধীন নগর গুলি, উহার প্রতিরোধে সম্পূর্ণ সমর্থ হইবে। অনেকে বলেন যে, বিদেশী অধিপতিকর্ত্তৃক ভারতাক্রমণের মধ্যে ইউরোপীয় শক্তি, সম্ভবত রুশিয়ার আক্রমণ ভয়ের বিষয়ীভূত হইয়া উঠিয়াছে। অনেকের হৃদয়ে সর্ব্বদা রুশভীতি জাগরূক রহিয়াছে। প্রভূত শক্তিসম্পন্ন দৈত্যের ন্যায় রুশ যেন, ভয়ঙ্কর শাত্রবভাবে পরিচালিত হইয়া, আমাদের হস্ত হইতে ভারতবর্ষ ছিনিয়া লইতে নিরন্তর ইচ্ছা করিতেছে। রুশের সম্বন্ধে এরূপ কুসংস্কার বড় বিস্ময়াবহ। আমার মতে এই কুসংস্কার এরূপ

অমূলক যে, তাহা বুঝাইয়া দিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। রুষভীতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ অপূর্ব্ব কল্পনায় উদ্ভ্রান্ত হইয়া থাকেন। ব্রাইট সাহেবের ন্যায় আমারও বিশ্বাস যে, "আমরা যেমন ভারতীয় সীমান্ত প্রদেশ অতিক্রম করিয়া, রুশের অধিকৃত জনপদ আক্রমণ করিবার বিষয় কখনও মনে করি না। তেমনই ভারতের সীমান্ত ভাগ অতিক্রম করিয়া ভারতসাম্রাজ্যে প্রবেশের সম্বন্ধে রুশের কোন রূপ ধারণার আবির্ভাব হয় নাই।" লর্ড সলিস্‌বরির ন্যায় আমিও অমূলক রুশভীতিগ্রস্ত কতিপয় ব্যক্তিকে বৃহদায়তন মানচিত্র কিনিতে পরামর্শ দিই। তাঁহারা ঐ মানচিত্র দেখিয়া বুঝিতে পারিবেন যে, রুশ সম্রাটের অধিকৃত জনপদ ও ভারতসাম্রাজ্যের অধীশ্বরীব অধিকারের মধ্যে কিরূপ অনতিক্রমনীয় প্রাকৃতিক অন্তরায় রহিয়াছে। লর্ড বীকন্সফিল্ডের ন্যায় আমারও বোধ হয় যে, 'দশ বৎসর পূর্ব্বে (১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে) যখন তাসকন্দ রুষের অধিকৃত হয়, তখন সকলেরই মনে হইয়াছিল যে, খাঁদিগের এই সকল জনপদেব সকলগুলি যে, রুশকর্ত্তৃক অধিকৃত হইবে, তাহা একরূপ নিশ্চিত। কেহ কেহ মনে করেন যে, রুশেব এই গতি অঙ্কুরাবস্থায় উন্মূলিত করা উচিত। এই উন্মূলনের অর্থই এই যে, ভারতের সীমার বাহিরে উপনীত হইয়া রুশের সহিত ঘোরতর কষ্টকর এবং যারপরনাই অজ্ঞানতামূলক সমরে প্রবৃত্ত হওয়া ইঙ্গরেজের কর্ত্তব্য। যাঁহারা এশিয়ায় রুশের অগ্রসর হওয়ার পক্ষে এইরূপ মত প্রকাশ করেন, আমি তাহাদের মধ্যে নই।" লর্ড বীকন্সফিল্ড ভবিষ্যবাণীর ন্যায় দূরদর্শিতার সহিত এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, প্রকৃতি ভারতরক্ষার জন্য যাহা সন্নিবেশিত করিয়া

রাখিয়াছে, শত্রুর আক্রমণ হইতে ঐ দেশ রক্ষার জন্য তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করা উচিত। এইরূপ বিশ্বাসই মধ্য-এশিয়াঘটিত জটিল বিষয় মীমাংসা করিবার উপায়। ইহাতে কোনরূপ গোলযোগ নাই। কোনরূপ বিপদেরও আশঙ্কা নাই। অধিকন্তু ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অল্পব্যয়সাধ্য। ইঙ্গলণ্ড এবং রুশিয়ার সমরসংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণ সমভাগে মানব জাতির শান্তি ও উন্নতির বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছেন। ভারতাক্রমণ রুশের পক্ষে যেমন মারাত্মক হইবা উঠিবে, এখন ইঙ্গরেজকর্ত্তৃক যে হিরাট আক্রমণের বিষয় অনেকেই অনুমোদন করিতেছেন, তাহাও ইঙ্গরেজ সৈন্যের সেইরূপ সঙ্কট ঘটাইবে। কোনও প্রদেশের অধিপতির নির্ব্বুদ্ধিতায় ও দুরভিসন্ধিতে যুদ্ধ ঘটিতে পারে, কিন্তু রুশকর্ত্তৃক ভারতাক্রমণ আমার নিকট বড় অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। আমরা যদি ভারতবাসীকে অধিক পরিমাণে রাজনৈতিক ক্ষমতা সমর্পণ করি, ভারতবাসীর সম্বন্ধে যদি বহুলপরিমাণে ন্যায়পরতা প্রদর্শন করি, যদি সমগ্র ভারত একতাসূত্রে আবদ্ধ হয়, তাহা হইলে কোনও সময়ে আমাদের বিপদের আশঙ্কা নাই। ফ্রান্স চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যেরূপ অসামর্থ্য প্রকাশ করিয়াছে, একতাসূত্রে সম্বদ্ধ সমগ্র ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে রুশও সেইরূপ অসমর্থ হইবে। অধ্যাপক সীলি দেখাইয়াছেন যে, জয়শব্দের প্রকৃত অর্থ ধরিলে ইঙ্গলণ্ড কখনও ভারতবর্ষ জয় করে নাই। ভারতের অধিবাসিগণও কখন ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বনের জন্য, একতাসূত্রে আবদ্ধ হয় নাই। যখন কোন ভারতীয় রাজ্যের স্বাধীনতা নষ্টকরা হইয়াছে, তখনই প্রায়শঃ

ভারতের অন্য রাজ্যের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবর্ষ কেবল মাত্র একটি জাতির আবাসভূমি ছিল না। সুতরাং ভারতও প্রকৃতপ্রস্তাবে ইঙ্গরেজকর্ত্তৃক জিত হয় নাই। যদি সমগ্র ভারত একটি প্রকৃত মহাজাতিতে পরিণত হইত, তাহা হইলে, কোন বিদেশী ভূপতি ভারতবর্ষ জয় করিতে পারিতেন না। আমরা ভারতে যে সকল জাতীয় ভাবের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, তৎসমুদয়ের পূর্ণতা পর্য্যন্ত ভারতে ইঙ্গরেজ-শাসন থাকিবে না। ভবিষ্যতে ভারতের স্বাধীন রাজ্য সকল ইঙ্গলণ্ডের ক্ষমতায়, পরস্পর সম্বদ্ধ ও একীভূত হইয়া উঠিবে। সমগ্র ভারত এই অবস্থায় পরিণত হইয়া সকল সময়ে আপনার ক্ষমতায় ও সমৃদ্ধির বলে বিদেশী শত্রুর আক্রমণে বাধা দিতে সমর্থ হইবে। যদি ইঙ্গলণ্ডের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জন্মে, যদি ইঙ্গলণ্ড প্রধান রাজ্য ও ভারতবর্ষ উহার উপনিবেশস্থানীয় হয় এবং যদি ইউরোপীয়েরা ভারতের এক একটি ইউরোপীয় ভাবাপন্ন স্বাধীন নগরে বাস করে, তাহা হইলে কেবল ভারত-প্রবাসী ইউরোপীয়দিগের অদূরদর্শিতামূলক ঈর্ষা দূর হইবে না, প্রত্যুত পরস্পর একতাসম্বদ্ধ রাজ্য সকল বলসম্পন্ন হইয়া সাধারণ শত্রুর প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইবে।

ইঙ্গলণ্ড ভারতবর্ষ হইতে আপনার সৈন্য অপসারিত করিলে ভারতবর্ষের ক্ষমতাপ্রতিষ্ঠার জন্য ইউরোপের অপরাপর রাজ্যের সহিত সম্বন্ধস্থাপন ইঙ্গলণ্ডের পক্ষে দুরূহ হইবে না। সকলে যদি দেখে যে, ইঙ্গলণ্ড সাধুভাবে আত্মস্বার্থমূলক নীতি পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা হইলে, ভারতবর্ষকে বিশেষ ক্ষমতা দিতে কেহই কোনরূপ গোলযোগ করিবে না। এই-

রূপ সাধুতার নিদর্শনে ভারতবর্ষের যে, কতদূর উন্নতি হইবে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

সামাজিক ও নৈতিক সঙ্কট।

যেমন মহারাণী আনের সময়ের ইঙ্গলণ্ড এলিজাবেথের সময়ের ইঙ্গলণ্ডের ন্যায় নহে, তেমন বর্ত্তমান ভারতবর্ষও লর্ড এলেনবরার সময়ের ভারতবর্ষের ন্যায় নহে। বাহ্য ব্যাপারের সম্বন্ধে ইহা যেরূপ ঠিক, নৈতিক, সামাজিক ও মানসিক উন্নতির সম্বন্ধেও সেইরূপ। বরং সামাজিক ও নৈতিক পরিবর্ত্তন অপেক্ষাকৃত অধিক। ইঙ্গলণ্ডে এ সম্বন্ধে বিপ্লব হয় নাই, ক্রমোন্নতি হইয়াছে। আভ্যন্তরীণ শক্তিতে স্বতউদ্ভূত উন্নতির বিকাশ হওয়াতে এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষে অপ্রাকৃত পরিবর্ত্তন হইতেছে। বাহ্য কারণ উহার সূত্রপাত হইয়াছে। উহা দুইটি ভিন্নপ্রকার সভ্যতার সংঘর্ষণের ফল। ঐ দুই সভ্যতার পরিপুষ্টির অসমান অবস্থায়, পরস্পরের সহিত সংঘর্ষ হইয়াছে। সুতরাং ভারতে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা কেবল উন্নতির বিষয় নহে। যত দূর দেখা গিয়াছে, তাহাতে উহা প্রকৃতপ্রস্তাবে বিপ্লবই বলিতে হইবে, অর্থাৎ প্রাচ্য দেশের সরল সমাজের মধ্যে পাশ্চাত্য জটিল সভ্যতা প্রবিষ্ট হইয়াছে।

এই বিপ্লবের প্রধান কারণ ইঙ্গরেজী শিক্ষা। ইহার পরিবর্ত্তন ও মিশ্রণকারক ক্ষমতায় প্রাচীন শৃঙ্খলা সকল বিনষ্ট হইতেছে। ভারতবাসীরা এক্ষণে পরিবর্ত্তনের সময়ে প্রবেশ করিয়াছে। কালসহকারে ঐ পরিবর্ত্তন হইতে নূতন সামাজিক শৃঙ্খলা ঘটিবে। ইঙ্গরেজী শিক্ষার অনিবার্য্য ফল বিশৃঙ্খলা। পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হইলে যে, অনেক অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে, তাহা স্বীকার না করিলে অন্ধ প্রশংসা করা

হয়। বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের পূর্ব্বে ত্রিশ শতাব্দীর বা তাহার অধিক কালের বহুদেবদেবীর উপাসনা-পদ্ধতি রহিয়াছে, উহা যে কোন আকারেই হউক না কেন, ভবিষ্যতের উপর নিশ্চয়ই প্রভাব বিস্তার করিবে। ইঙ্গরেজী শিক্ষা দ্বারা ধারাবাহিক প্রণালী বিনষ্ট হয়। লোকের আচার ও মত ইঙ্গরেজী শিক্ষায় পরিবর্ত্তিত হয়, এমন কি জীবিকানির্ব্বাহের প্রণালীও ভিন্নরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু যে পরম্পরাগত প্রভাব দ্বারা জাতীয় উন্নতি নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, উহা তাহাকে স্পর্শ করে না। সমাজ পরিচালিত করিবার কিংবা সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করিবার ক্ষমতা ইঙ্গরেজী শিক্ষার নাই। শাসনকর্ত্তারা সমভাবাক্রান্ত লোকের উপর ক্ষমতা বিস্তার করিয়া তাঁহাদের মহানুভাবকত্ব বৃদ্ধি করিতে সমর্থ, কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতির লোকের উপর তাঁহাদের ক্ষমতা অন্যরূপ। যে বিদ্যালয়সকল বিদেশীদের কর্তৃত্বাধীন থাকে, তৎসমুদয় দ্বারা কোন স্থায়ী মঙ্গল হইতে পারে না। কেন না, বিদেশীগণ দেশীয়দিগের অভাব সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। রাজকর্মচারীদের দ্বারা পাশ্চাত্য ভাব সকল প্রচার করা অসম্ভব। পূর্ব্বকালে রোমক শাসনকর্ত্তারা রাজ্যমধ্যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারে অসমর্থ হইয়াছিলেন। ইঙ্গরেজ রাজপুরুষগণও হিন্দুদের পৌত্তলিকতা বিনষ্ট করিতে তাঁহাদের অপেক্ষা অধিকতর কৃতকার্য্য হইবেন না। এরূপ পরিবর্ত্তন কেবল দেশীয় ও বিদেশীয়গণের সমবেত ও স্বতঃপ্রবৃত্ত চেষ্টায় সংঘটিত হইতে পারে। পশ্চিম হইতে নূতন মত আইসে, কিন্তু পূর্ব্বদেশস্থ জ্ঞানিগণ তাহা উপযুক্ত আকারে পরিণত করেন।

পাশ্চাত্য দেশেই উন্নতিসাধক মতের উৎপত্তি হয়।

মানবের অগ্রণীগণ পাশ্চাত্যদেশবাসী। তাঁহাদের মধ্যে যে নিয়ম অনুসারে উন্নতি হইয়াছে, অন্যান্য জাতিতে সে নিয়মের অন্যথা হইতে পারে না। যেহেতু এক মূল নিয়ম অনুসারে সমগ্র মানবজাতির উন্নতি হইয়া থাকে। কিন্তু ইউরোপের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে, মানবের উৎসাহে যাহা কিছু হইয়াছে, তাহার সকল বিষয়েই বিশৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায়। নানা জাতি, নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়, নানা শ্রেণীর লোক কেবলই বিবাদ করিয়া পরস্পর পৃথক হইতেছে। বর্ত্তমান অবস্থা যে, সন্তোষজনক নহে, তাহার একটি প্রধান প্রমাণ এই যে, আমাদের মধ্যে এরূপ অনেক লোক আছেন, যাঁহারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের ভগ্নাবশেষের উপর জাতীয় একতাবন্ধনের আশা করিয়া থাকেন। ইহা আরও দুঃখের বিষয় যে, অনেকে ইউরোপীয় সভ্যতার বাহ্য চিহ্ন সকল এদেশে আমদানী করিতে ইচ্ছা করেন, নৈতিক শাসনের বড় একটা প্রয়োজন বোধ করেন না। বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপে যে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা এক দিকে প্রাচীন কাথলিক ধর্ম্মের অনুদার নীতি ও অপরদিকে ভবিষ্যৎ সময়ের মঙ্গলময় নীতি—এই দুই নীতির মধ্যবর্ত্তী সময়ের সূচনা করিতেছে। এই নীতি স্থায়ী ও উন্নতিশীল সাধারণ-মতের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই অরাজকতা প্রাচ্য দেশে সমানীত হইলে কি হয়?—সেখানে উহা সামাজিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে স্বভাবতঃ উৎপন্ন নহে। সেখানে বিদেশ হইতে আনীত হইয়া, দেশীয় সমাজবন্ধন সকল বিচ্ছিন্ন করে। সেখানে উহা সর্ব্বধ্বংসের মূল হয়। এজন্য উহার অশুভফল ভবিষ্যতে কোন না কোন দিন সর্ব্বপ্রথমে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

পাশ্চাত্য দেশ যত দিন একতাসূত্রে সম্বদ্ধ না হইতেছে, ততদিন উহা অপেক্ষাকৃত উন্নত লোকের উপর কোনরূপ ক্ষমতা বিস্তার করিতে পারিবে না। এখন কোনরূপ সংস্কারের চেষ্টা করা সময়োচিত নহে। প্রাচ্যদেশে রোমের যেরূপ প্রভুত্ব ছিল, ভারতে ইঙ্গরেজদেরও সেইরূপ প্রভুত্ব আছে। শান্তিরক্ষা করাই রোমের যেরূপ প্রধান ভাবনার বিষয় ছিল, ইঙ্গরেজদেরও সেইরূপ হওয়া উচিত। যাহাতে বিনা গোলযোগে প্রাচীন সামাজিক নিয়মের স্থলে পরিবর্ত্তন সহকারে নূতনভাব সহজে স্থাপিত হইতে পারে, তাহার জন্য দেশের বর্ত্তমান অবস্থারক্ষা করাই আমাদের গবর্ণমেণ্টের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

ইহা সৌভাগ্যের বিষয় যে, গবর্ণমেণ্ট যাহা করিতেছেন তাহার ফল ভারতবর্ষের অল্প লোকেই ভোগ করিতেছে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকদিগের নীতি ও সভ্যতামূলক ক্ষমতার বা শিক্ষাবিভাগের চেষ্টার ভারতের অধিকাংশ লোক বিচলিত হয় নাই। উপযুক্ত সময়ের পূর্ব্বে জনসাধারণের বিশ্বাস ও কুসংস্কার উন্মূলিত করা ঘোর অনিষ্টজনক। যখন উন্নতিশীল সম্প্রদায় রীতিমত পাশ্চাত্য সভ্যতায় অনুপ্রাণিত হইবেন, তখন সাধারণ লোকের মধ্যে কি উপায়ে পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে, তাহা বিবেচনা করিবার সময় আসিবে।

উহা অপেক্ষা আর একটি গুরুতর কারণে আমাদের সৌভাগ্য মনে করা উচিত। বিপ্লবের যে পূর্ব্বাবস্থায় বিদেশী গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাদানে ব্যাপৃত ছিলেন, সে অবস্থা শেষ হইয়া আসিল। প্রথমাবস্থায় রাজকীয় কর্ত্তৃত্ব না

থাকিলে চলিত না। ইহা না হইলে অন্য কোন উপায়ে শিক্ষাকার্য্যের আরম্ভ হইত না। কিন্তু এখন ভারতের শিক্ষা-কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের আর প্রয়োজন নাই। ইঙ্গরেজী শিক্ষার গুণে উন্নতিশীল ও স্বাধীনভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে, সুতরাং লোকে আর পূর্ব্বের ন্যায় গবর্ণমেণ্টের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে ইচ্ছা করে না। সকল প্রেসিডেন্সিতেই ইঙ্গরেজী শিক্ষাব রব উঠিতেছে। ইহাদ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে, যেমন ইউবোপে, তেমনই ভাবতবর্ষেও জনসাধারণ শিক্ষাব জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। তাহাবা আপনারই এই ব্যাকুলতার শান্তি করিতে সচেষ্ট হয, অন্য কাহাকেও জোব কবিযা উহা নিবাবণ কবিতে হয না। গবর্ণমেণ্ট ও মিসনবি বিদ্যালয ব্যতীত, ইঙ্গবেজী ভাযাভিজ্ঞ শত শত ছাত্রপূর্ণ স্বাধীন বিদ্যালয সকল সুচারুরূপে চলিতেছে। এই সকল বিদ্যালয এরূপ শিক্ষাব, এরূপ শৃঙ্খলার ও এরূপ নৈতিক বিধানের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছে যে, পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত স্কুলকলেজ গুলিও তৎসমুদযেব জন্য লালাযিত হইতে পারে। অন্য বিষযে যেরূপ হউক, শিক্ষাকার্য্যে ভারত-বর্ষীয়গণ আত্মশাসন প্রাপ্ত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। উচ্চশ্রেণীব বিদ্যালয় যে, কেবল ভাবতবর্ষীয়গণকর্ত্তৃক সুচারুরূপে পবিচালিত হইতে পাবে, সে বিষয়ে আব সন্দেহ নাই। শিক্ষাদানের ভাব ক্রমে ভাবতবর্ষীযদিগের হস্তে সমর্পিত হই-তেছে। গবর্ণমেণ্ট বড় বড় বিদ্যালযের জন্য যে স্থায়ী আয নির্দ্ধারণ করিযা দিয়াছেন, তাহা ঐ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষিত লোকদের হস্তে সমর্পণ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কার্য্য এক্ষণে যেরূপ অসন্তোষকর হইয়া উঠিয়াছে,

তাহাতে প্রতিনিধিপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া উহার সংস্কার করা উচিত। পাশ্চাত্যভাব সকল কিরূপে ভারতবর্ষীয়দিগের হৃদয়ে অন্তর্নিবিষ্ট করা যাইতে পারে, তাহার মীমাংসার সময় আসিয়াছে। যে সকল ভারতবাসী আমাদের বর্ত্তমান প্রণালীতে সুশিক্ষিত ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত সম্যক্ পরিচিত হইয়াও স্বদেশের পূর্ব্বতন ভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছেন, তাঁহারাই ঐ বিষয়ের মীমাংসা করিতে সমর্থ।

এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে কোন মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারিতার সময় শেষ হইয়াছে। এখন হইতে কি প্রকারে দেশে শান্তি থাকে, তাহাই গবর্ণমেণ্টের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। পক্ষান্তরে যাঁহারা বর্ত্তমান পরিবর্ত্তন নিয়মিত করিতে সক্ষম, তাঁহাদেরই হস্তে উক্ত বিষয়ের ভার ছাড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কিছু কালের জন্য দেশ রক্ষা ও প্রয়োজনমত আশ্রয় দান করাই গবর্ণমেণ্টের প্রধান কার্য্য। প্রাচীন ধর্ম্মশাসনের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করা উচিত নহে। হিন্দুদের পৌত্তলিকতাই বর্ত্তমান নৈতিক শৃঙ্খলার মূল। উহাতে এরূপ বিভিন্ন ভাব নিহিত আছে যে, উহা যেমন একদিকে সূক্ষ্ম দার্শনিকগণের, তেমনই অন্যদিকে নিরক্ষর কৃষকদিগেরও হৃদয়গত ভাবের উপযোগী। উহাতে সজীবতা, শৃঙ্খলা ও স্থায়িত্ব গুণও বিদ্যমান আছে। স্থায়িত্বই উহার প্রধান গুণ। জাতিভেদ হিন্দু সমাজের সকল প্রকার অনিষ্টের কারণ হওয়া দূরে থাকুক, বরং উহা দ্বারা পূর্ব্বতন সময়ে অনেক উপকার সাধিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়েও উহাতে সমাজ শৃঙ্খলাযুক্ত ও দৃঢ়ীভূত হইয়াছে।

হিন্দুধর্ম্মের প্রশংসনীয় শৃঙ্খলার স্থানে উন্নতির সংহারিণী মূর্ত্তি স্থাপন করা কখনও উচিত নহে। শৃঙ্খলা থাকে উন্নতি না হউক, সেও ভাল, কিন্তু বিশৃঙ্খলার সহিত উন্নতি হওয়া ভাল নহে। হিন্দুধর্ম্ম এখনও প্রভূততেজঃপূর্ণ; আর উহার দার্শনিক সূক্ষ্মতা এবং বিস্তৃত ক্ষমতা এখনও জীবনীশক্তিসম্পন্ন। ভবিষ্যতে উহার সূক্ষ্মভাব সকল রক্ষিত হইয়া উচ্চতর ধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইবে। উপস্থিত সময়ে হিন্দুধর্ম্মের পরিবর্ত্তে এমন কোন ধর্ম্ম স্থাপিত করা যায় না, যাহাতে জাতীয় জীবন প্রতিফলিত হইতে পারে এবং যাহা লোকের ভক্তি ও প্রেমের কেন্দ্রীভূত হইয়া উঠিতে পারে।

যতদূর সম্ভব, সামাজিক শৃঙ্খলারক্ষা করা এবং অনাবশ্যক গোলযোগের উদ্রেক না করাই আমাদের কার্য্য। রাজনীতির বিষয়ে রাজার ইহাই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য, কিন্তু সামাজিক ও নৈতিক বিষয়ের সম্বন্ধেও উহা আমাদের ততোধিক কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সামাজিক শৃঙ্খলার প্রতি প্রথমে আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত। এজন্য সূক্ষ্মরূপে হিন্দুদের জাতিভেদপ্রণালীর আলোচনা ও উহার যথার্থ ভাব উপলব্ধি করার অপেক্ষা আমি আর কিছুই অধিকতর প্রয়োজনীয় বোধ করির না। উহাতে অনেক ত্রুটি আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা হইতে যে উপকার হইতেছে, তাহা সেই সকল ত্রুটিকে অধঃকৃত করিয়াছে। যে সকল সমাজসংস্কারক জাতিভেদ-প্রথা হিন্দু সমাজের সর্ব্বপ্রকার অনিষ্টের মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা ইহা ভাবেন না যে, বদ্ধমূল সংস্কার জনসাধারণের হৃদয় হইতে অপনীত করা কতদূর দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাঁহারা ভাবেন না যে, জাতিভেদের উচ্ছেদ সাধন করিলে যদি কোনরূপ ধর্ম্মশাসন তাহার স্থান অধিকার না করে, তাহা হইলে

মহা অনিষ্টের উৎপত্তি হইবে। তাঁহারা ইহাও ভাবেন না যে, জাতিভেদপ্রথা সামাজিক বিধি বলিয়া যত প্রবল, ধর্ম্ম-বিধান বলিয়া তত নহে। হিন্দুধর্ম্মে যাহাদের বিশ্বাস নাই, তাহারাও অনেকে উচ্চজাতীয় বলিয়া পরিচিত হইতে যত্ন করে এবং প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। জাতিভেদ-প্রথা এক্ষণে হিন্দুসমাজকে একত্র রাখিবার যন্ত্র স্বরূপ। উহা প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মকে বর্ত্তমান শৃঙ্খলায় নিবদ্ধ রাখিবার উপায়। ভবিষ্যতের সমস্যার পূরণ করিতে হইলে জাতিভেদ উচ্ছেদ করিলে চলিবে না। উহা কেবল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে মাত্র, অধিকন্তু উহার বিশেষ বিশেষ ভাব রক্ষা করিতে হইবে এবং উহা অপ্রাকৃত বিষয়ের উপর স্থাপন না করিয়া ক্রমে ক্রমে সামাজিক প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

জাতিভেদরূপ মহৎ প্রথার উপর যে অযথা ঘৃণা প্রদর্শিত হইয়া থাকে, কোমৎ ঐ প্রথা ভাল বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে ঐ ঘৃণার ভার বিদূরিত হইতে পারে। জাতিভেদের গুণ সম্বন্ধে কোমৎ বলেন,—

"জাতিভেদপ্রথা এক সম্প্রদায়কে চিন্তা করিতে অবকাশ ও মর্য্যাদা প্রদান করিয়া, কতকগুলি লোককে মত প্রকাশের জন্য এবং কতকগুলিকে কার্য্য করার জন্য চিরস্থায়ীরূপে ভাগ করিয়া দিয়াছে। এই সময়েই প্রকৃত জ্ঞানের মূলতত্ত্ব সকল উদ্ভাবিত হইয়াছে। মানব জাতির মানসিক গতি ও উন্নতির পথও এই সময়ে নিয়মিত হইয়া উঠিয়াছে। জাতিভেদের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত, চিত্র, খোদাই কাজ প্রভৃতি সুকুমার বিদ্যারও উন্নতি হইয়াছে। কেবল আমোদের জন্য প্রথমে

ঐ সকল বিদ্যার অনুশীলন হয় না, পূজা ইত্যাদির অঙ্গবিশেষ ও ধর্ম্মপ্রচারের সুবিধা এবং ধর্ম্মোপার্জ্জন হইবে বলিয়াও উহার অনুশীলন হইয়া থাকে। উহা দ্বারা শ্রমসাধ্য কার্য্যের অধিকতর পরিপুষ্টি হইয়াছে। ঐ কার্য্যে অসাধারণ ধীশক্তির প্রয়োজন হয় নাই, শাসনকর্ত্তার মনে ভয়ও জন্মে নাই। অথচ শান্তির সময়ে সমবেত চেষ্টাবলে প্রকাণ্ড ব্যাপার সকল সম্পন্ন হইয়াছে। জাতিভেদপ্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের আবিষ্কার লোপ পাইয়াছিল, ইহাতেই জাতিভেদের প্রয়োজনীয়তা প্রথমে উপলব্ধি হয়। সূত্রধর, কুম্ভকার ইত্যাদির বিশেষ বিশেষ কার্য্য পূর্ব্বে লোকের ইচ্ছাধীনে বিচ্ছিন্নভাবে ছিল। পরে জাতিভেদপ্রথা দ্বারা ঐ সকল বিশেষ বিশেষ কার্য্য বিশেষ বিশেষ শ্রেণীতে সন্নিবেশিত হয়। ইহাতে জাতিভেদের উপকারিতা সপ্রমাণ হইয়াছে। এই পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রসূত জাতিভেদ নানাবিধ গুণের প্রতি সম্মান দেখাইবার যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছে, এমন আর কোথাও হয় নাই। আবিষ্কর্ত্তাগণ বিশেষ বিশেষ জাতির উপাস্য দেবতা পর্য্যন্ত হইয়াছেন। সামাজিক ভাবে দেখিলেও ইহার অনেক গুণ বুঝাযায়। রাজনীতির ভাবে ইহার প্রধান গুণ স্থায়িত্ব। এই প্রথা দ্বারা একাগ্রতার সহিত আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য আক্রমণ নিবারণের উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল। আভ্যন্তরীণ অবস্থায় সকল জাতিই পুরোহিতদিগের বাধ্যছিল; কারণ পুরোহিতেরা সকল জাতির বিশেষ বিশেষ বিদ্যার শিক্ষা-গুরু ও উৎসাহদাতা ছিলেন। সর্ব্বোৎকৃষ্ট বর্ণ যেমন তেজস্বিতা, শৃঙ্খলা ও মানবীয় শক্তির স্থায়িত্বের অধিকারী ছিলেন,

এমন আর কেহই ছিলনা। এই সম্প্রদায়ের লোকে (অন্ততঃ প্রধান যাজকেরা) কেবল যাজক ও শাসনকর্ত্তা ছিলেন না, তত্ত্বজ্ঞানী শিল্পকর, স্থপতিবিদ্যাবিৎ ও চিকিৎসকও ছিলেন। *** নীতির সম্বন্ধে জাতিভেদপ্রথায় ব্যক্তিগত নীতি, ও পারিবারিক নীতি, উভয় বিষয়েই অনেক উপকার হইযাছিল। কারণ পারিবারিকভাব বিস্তৃত করাই জাতিভেদপ্রথার উদ্দেশ্য। বহুবিবাহ-প্রথা থাকাতেও স্ত্রীলোকদিগেব অবস্থা উন্নত হইযাছিল। যেহেতু অসভ্যতাব সময়ে তাহারা যে কষ্টকর কার্য্যে নিযুক্ত হইত, তাহা হইতে মুক্ত হইনাছিল। আর বহুবিবাহপ্রসূত অবরোধ-প্রথা স্ত্রীলোকদিগেব সম্মানেব প্রথম চিহ্ন, এবং তদ্বারা তাহাদেব প্রকৃতির অনুকূল অবস্থিতিস্থল নির্দ্দিষ্ট হইযাছিল। এই প্রথা সামাজিক নীতির অংশেও ভাল ছিল। যেহেতু ইহাতে বৃদ্ধ ও পূর্ব্ব পুরুষগণ সম্মানিত হইতেন। জাতির প্রতি অনুবাগ স্বদেশানুবাগে তখনও পরিণত হয় নাই। আমাদেব চক্ষে ঐ অনুবাগ সঙ্কীর্ণ বোধ হইতে পাবে, কিন্তু উহা বিস্তৃত দেশানুবাগেব পূর্ব্বাভাস মাত্র।”

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচাবকগণ জাতিভেদের নিন্দা কবেন। কারণ লোকে আধ্যাত্মিক উপকার না পাইয়াও যে যাজকতার পক্ষ সমর্থন করে, তাঁহাবা কোন মতে সেই যাজকসম্প্রদাযের উচ্ছেদ করিতে পাবেন না। ইঙ্গবেজ শাসনকর্ত্তারা জাতিভেদ দূষণীয় মনে করেন, যেহেতু হিন্দুবা অধীন জাতি হইয়াও সামাজিক শাসনের উপর তাঁহাদিগকে কর্ত্তৃত্ব করিতে দেয় না এবং ক্ষমতাপন্ন হইলেও তাঁহারা তাহাদেব নিকটও যারপরনাই নীচ জাতি বলিয়া বিবেচিত হন। ভারতবর্ষে উপস্থিত হইবার

অব্যবহিত পরে আমার মনে কি ভাব হইয়াছিল, তাহা আমার বেশ স্মরণ আছে। ঐ সময়ে আমার অধীনস্থ একজন ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীর সহিত সন্ধ্যাকালে যখন আমি ভ্রমণ করিতে ছিলাম, তখন যে সকল হিন্দুর সহিত পথে আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাঁহারা উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের প্রতি যেরূপ করিতে হয়, আমাকে সেইরূপ সম্মানের সহিত অভিবাদন করিয়াছিল। পক্ষান্তরে আমার সঙ্গীকে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিয়াছিল। তাঁহার প্রতি তাহারা আপনাদের হৃদয়গত ভক্তির পরিচয় দিল, আমার প্রতি কেবল বাহ্য সম্মানের চিহ্ন দেখাইল মাত্র। রাজকার্য্যঘটিত সম্বন্ধ সামাজিক অধীনতার অতলভাবে নিমজ্জিত হইয়া গেল। কেবল নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাই যে, এই ভাবে পরিচালিত হয়, তাহা নহে। সকলেই সামাজিক শাসনের প্রতি এই রূপ সম্মান দেখাইয়া থাকে। জাতিভেদ-প্রথা আজ পর্য্যন্ত সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই সমভাবে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। শিক্ষিত হিন্দুগণ আপনাদের সমাজের নিকট কতদূর ঋণী, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। কোন কারণে জাতিভেদের আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য না হইলেও কেন তাহারা জাতিভেদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন, তাহাও তাঁহাদের বোধগম্য হয় না। যাহা হউক, জাতিভেদ প্রথা এখনও এরূপ ক্ষমতা বিকাশ করিতেছে যে, প্রাচীন হিন্দুগণ সমস্ত সামাজিক নিয়ম পালন করিয়া উহার প্রতি যেরূপ সম্মান দেখাইতেন, নব্য সম্প্রদায় ঐ নিয়মের সকলগুলি পালন না করিয়াও উহার প্রতি সেইরূপ সম্মান দেখাইয়া থাকেন। তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ জাতিচ্যুত হওয়া

যেরূপ ক্লেশকর মনে করিতেন এবং কেহ সমাজবিরুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাঁহাকে যেরূপ সমাজচ্যুত করিতেন, তাঁহারাও সেইরূপ করিয়া থাকেন। স্বজাতির অনেক দোষ ও ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের ন্যায় স্বজাতিভুক্ত হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন। যাঁহারা হিন্দু সমাজ হইতে নিষ্কাশিত হইয়াছেন, তাঁহারা আপনাদের মধ্যে জাতি-ভেদের অনুরূপ কোন প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ফিরিঙ্গি ও খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মাবলম্বী ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে একরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। অধিকতর উন্নতাভিমানী ব্রাহ্ম দিগের মধ্যেও একটি অভিনব জাতির প্রতিষ্ঠা হওয়ার উপক্রম দেখা যাইতেছে। এক জন খাল্সা শিখও কিছুকাল পরে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিবে এবং জাতি-ভেদপ্রথা মানিয়া চলিবে। হিন্দুদের সংসর্গে মুসলমানদিগের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। হিন্দুদের মধ্যে যেমন বিশেষ বিশেষ গোত্রের বিশেষ বিশেষ সম্মান ও মর্য্যাদা আছে, মুসলমানদের মধ্যেও বিবাহসম্বন্ধে সেইরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

ব্রাহ্মণদিগের পৌত্তলিকতা যেমন হিন্দু ধর্ম্মনীতির মূল, জাতিও সেইরূপ সামাজিক শৃঙ্খলার মূল। জাতিভেদপ্রথার সহকারী একান্নবর্ত্তী পরিবারপ্রথাও পল্লী সমাজের ন্যায় সামাজিক শৃঙ্খলার মূল। ঐ প্রথারও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বাহ্য ঘটনার শক্তিতে ক্রমে উহা আরও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। উহা ভবিষ্যতে কিরূপ হইবে, তাহা যত দিন হিন্দুজাতি আপনাদের সামাজিক উন্নতিবিধানের দায়িত্ব স্কন্ধে না লইতেছেন, তত দিন বলা যায় না। বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহাদের মধ্যে কোন

রূপ পূর্ণ আদর্শ নাই। রাজনৈতিক স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুত হওয়াতে সকলে মিলিয়া কোন গুরুতর কার্য্য করিলে যেরূপ যুক্তি ও নীতিসঙ্গত ভাবের বিকাশ হয়, তাঁহাদের মধ্যে সে ভাব জন্মে নাই। রাজনৈতিক বিষয়ে এখন তাহাদের চিন্তা ও কার্য্যগত একতা অনেক পরিমাণে দেখা যাইতেছে। ইহাতে আশা হয় যে, সামাজিক ও নৈতিক বিষয়ে শীঘ্রই ঐ রূপ একতা দৃষ্ট হইবে। বিষয়টি অতি কঠিন। যাহারা এই কঠিন বিষয়ের প্রতীকারে সমর্থ হইবেন, বিষয়ের কাঠিন্যের পরিমাণ অনুসারে তাহাদের গৌরব ও প্রশংসার পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে। গর্ডিয়সের জটিল গ্রন্থি * এক আঘাতে বিচ্ছিন্ন করা কঠিন নয়, উহাতে কোনও গৌরবও

* একরূপ কিংবদন্তী আছে যে এশিয়ামাইনরের অন্তঃপাতী ফ্রিজিয়া প্রদেশের গর্ডিয়স্ নামক একজন দুঃখী কৃষক একদা হলচালনা করিতেছিল। এই সময়ে সহসা তাহার হলযোজিত বলদের যুগের উপর একটি ইগল পক্ষী আসিয়া বসিল। উক্ত পক্ষী রাত্রি পর্য্যন্ত ঐ যুগের উপর রহিল। গর্ডিয়স ভবিষ্যদ্বক্তাদের নিকট এই আকস্মিক ব্যাপারের মর্ম্ম বুঝিবার জন্য তেলমিসস্ নামক স্থানে যাত্রা করে। পথে একটি ভবিষ্যবাদিনী বালিকার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। বালিকা তাহাকে জুপিতর দেবের উদ্দেশে বলি দিতে বলে এবং স্বয়ং ঐ বলির প্রকরণ বলিয়া দেয়। গর্ডিয়সের সহিত ঐ বালিকার বিবাহ হয়। কিছু কাল পরে ফ্রিজিয়া প্রদেশে বিরোধ ঘটিলে এই ভবিষ্যবাণী হয়, যে ভূপতি রথারোহণে আসিবেন, তিনিই এই গোলযোগের শান্তি করিতে পারিবেন। গর্ডিয়স ঐ ভাবে আসিলে রাজা বলিয়া পরিগৃহীত হয় এবং আপনার রথ ও হলযুগ জুপিতর দেবের নামে উৎসর্গ করে। এই সময়ে গর্ডিয়স হলদণ্ডের সহিত যুগ একরূপ কৌশলে বন্ধন করে যে, সেই গ্রন্থি কিছুতেই খুলিতে পারা যায় না। এসম্বন্ধে এক দৈববাণী অন্ততঃ জনশ্রুতি ছিল, যে ব্যক্তি গর্ডিয়সের গ্রন্থি খুলিতে পারিবে, এশিয়ার আধিপত্য তাহার হইবে। সেকন্দর শাহ যখন গর্ডিয়সের নগরে উপনীত হন, তখন তিনি তরবারি দ্বারা গর্ডিয়সের গ্রন্থিছিন্ন করিয়া ভবিষ্যবাণী পূর্ণ হইল বলিয়া ঘোষণা করেন। বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কোন দুঃসাধ্য ব্যাপার তাড়াতাড়ি সম্পাদনের প্রসঙ্গ হইলে এখন সচরাচর গর্ডিয়সের গ্রন্থিচ্ছেদের কথা উঠে।—অনুবাদক।

নাই। গবর্ণমেণ্ট এখন ঐরূপ রীতির অনুসরণ করিতে চান। যে সকল পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তাহা ভারতবাসিগণকর্ত্তৃক সম্পন্ন হওয়া উচিত। ভারতবাসিগণ আপনাদের জাতি, অভিলাষ ও স্বতঃসিদ্ধ উৎসাহে পরিচালিত হইয়া ঐ সকল বিষয় সম্পন্ন করিবেন। বিদেশীয় শাসকগণকর্ত্তৃক যে সামাজিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তাহা অস্বাভাবিক ও কৃচ্ছ্রসাধ্য। জাতীয় ভাব হইতে সম্পন্ন না হওয়াতে উহা স্থায়ী হইতে পারে না।

ফলতঃ ভারতবর্ষে হউক, বা অন্য কোন দেশেই হউক, সামাজিক ও নৈতিক সংস্কার আভ্যন্তরীণ শক্তিজনিত না হইলে ফল দায়ক হয় না। অতীত কালের ক্ষমতা ও বর্ত্তমান কালের কার্য্যদ্বারা উহা সংগঠিত হওয়া উচিত। বহুকাল ধরিয়া পরিবার মধ্যে যে ভাবের বিকাশ হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিলে চলিবে না। ষষ্ঠী, শালগ্রাম প্রভৃতি গৃহদেবতা যে পরিবারে পূজিত হইতেছে, তাহাদের মধ্যে সংস্কারকার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। এই জন্য বিদেশী গবর্ণমেণ্ট যে সভ্যতার সমর্থন করিতেছেন, রাজপুরুষগণ যে পাশ্চাত্য ভাব বলপূর্ব্বক জনসাধারণের মধ্যে বিকাশ করিয়া দিতেছেন এবং শিক্ষাবিভাগ যে শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত করিতেছেন, তাহা কার্য্যকর হয় না; যাবৎ বিদ্যালয়ে একরূপ শিক্ষা ও পরিবারমধ্যে অন্যরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে, তাবৎ উহা প্রকৃত শিক্ষা বলিয়া পরিগণিত হইবে না। যাঁহারা হিন্দুদিগের পারিবারিক অবস্থা জানেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন যে, হিন্দু যুবকগণ যখন বাড়ীতে থাকেন, তখন সেই অবস্থাগত ভাবের সহিত তাঁহাদের বিদ্যালয়ে অবস্থিতিগত ভাবের কতদূর পার্থক্য আছে।

হিন্দুদের পারিবারিক জীবন ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা কুনীতিকর নহে। এ সম্বন্ধে অনেকের ভ্রম আছে। উহা দূর করিবার জন্য প্রকৃত অবস্থা কি, তাহা বলিতেছি। পরিবারস্থ সকলের প্রতি হিন্দুদের যে গভীর স্নেহ আছে, তাঁহা অতি প্রশংসনীয়; উহা তাহাদের জাতীয় স্বভাবের একটি বিশেষ চিহ্ন। ঐ স্নেহ কেবল হৃদয়গত ভাবে পর্য্যবসিত হয় না, উহা কার্য্যত অনেক রূপ দানশীলতায় পরিস্ফুট হয়। সন্তানের প্রতি পিতা মাতার মমতা এবং পিতা মাতার প্রতি সন্তানের অনুরাগ অতি মর্ম্মস্পর্শী। সকলের সহিত স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ, চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষার জন্য কঠোররূপে নিয়োজিত এবং বয়োবৃদ্ধ প্রতিবেশী, স্বজাতি আত্মীয়স্বজনের মতানুসারে শাসিত হিন্দুপরিবারের গার্হস্থ্য জীবন অতি পবিত্র এবং আমাদের অনুকরণীয়, সন্দেহ নাই। হিন্দু যুবকদিগের পারিবারিক অবস্থার মূলে কোনও অন্যায় বিষয় নাই, কিন্তু তাহাদের জীবনের ঘটনার মধ্যে এখন বড় অনৈক্য দেখা যায়। মনে কর, মাতা কিংবা পরিবারস্থ অন্য স্ত্রীলোকেরা সূর্য্যোদয় বা সূর্য্যাস্ত সময়ে পুষ্পাদি দ্বারা গৃহদেবতার পূজা করিতেছেন। এদিকে সন্তানগণ মধ্যাহ্নসময়ে মিল্টন-প্রণীত "আরিওপাজেটিকা" নামক প্রিয় পাঠ্য পুস্তক অভিনিবেশ সহকারে বুঝিতেছেন, কিংবা পৌত্তলিকতা ও যাজকতার বিরোধী অন্য কোন গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। মাজিষ্ট্রেটগণ কাছারিতে বসিয়া যেমন বিচার করেন, শিক্ষাবিভাগের অধ্যাপকগণও সেই রূপ মিল্‌টন ও মিলের সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া থাকেন। তাঁহারা কোন রূপে আপনাদের কাজ শেষ করেন মাত্র। শিক্ষার্থীদিগের

নীতিজ্ঞানের উৎকর্ষসাধনে কোন চেষ্টা করেন না। কিরূপে তাঁহাদের আচরণ ও মানসিক ভাব ভাল হয়, কিরূপে রাগ দ্বেষাদি সংযত হইয়া উঠে, তাঁহারা তাহার জন্য ভাবিয়া দেখেন না। যুবকেরা বাটীর চারিদিকে যে সকল ভাবের বিকাশ দেখে, তাহাদের চরিত্র সেই ভাবেই গঠিত হইয়া থাকে। অন্য কোন রূপে উহা উন্নত বা পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করা হয় না। এজন্য মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষসাধনের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য দূরতা রহিয়াছে। লোকে যেমন অসারগর্ভ বেশভূষা বাড়ীতে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, সেইরূপ যুবকেরা বিদ্যালয়ের অধ্যাপকের নিকট যে সকল উচ্চ ভাবের শিক্ষা পায়, বাটীতে তাহা নিষ্প্রয়োজন মনে করে। অনেক স্থলে ঐ সকল ভাব তাহাদের যথার্থ আন্তরিক ভাব নহে। ইহার প্রমাণ এই যে, যদিও হিন্দু-ধর্ম্মে শিক্ষিতদিগের বিশ্বাসের হ্রাস দেখা যায়, তথাপি ঐ হিন্দু-ধর্ম্ম দ্বারাই অনেক পরিমাণে তাহাদের সামাজিক ও নৈতিক সংস্কার সংগঠিত হইতেছে। ইহা হইতে একরূপ সামাজিক অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে। ঐ অরাজকতার জন্য গবর্ণমেণ্ট দায়ী। কিন্তু উহার প্রতীকার করিতে গবর্ণমেণ্টের কোন ক্ষমতা নাই। রাজার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা স্বাভাবিক। রাজ-বিধি দ্বারা সামাজিক অবস্থা অপনীত হইতে পারে, এরূপ মনে করাও স্বাভাবিক, কিন্তু যদিও রাজবিধির বলে কোন কুপ্রথা নিবারিত হইতে পারে, তথাপি গবর্ণমেণ্ট অনেক স্থলে কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন না, যাহা পারেন, তাহা অতি সামান্য। লোকের সম্পত্তি ও শান্তি রক্ষা করা ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট আর অধিক কিছু করিতে পারেন না। সতীদাহের ন্যায় যে সকল

প্রথা নরহত্যার নামান্তর মাত্র, গবর্ণমেণ্ট তাহা রহিত করিতে পারেন। কিন্তু এরূপ স্থলেও যে হৃদয়গত ভাব হইতে ঐ প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সমূলে উচ্ছেদ করিতে পারেন না।

এখন একরূপ সামাজিক অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে। যদিও ঐ অরাজকতা সম্প্রসারিত হয় নাই, যদিও অল্প লোকের মধ্যে উহা আবদ্ধ রহিয়াছে, তথাপি সমাজের মধ্যে একটি বিশৃঙ্খল দল থাকাতে অনেক অনিষ্টের কারণ হইয়াছে। এই শ্রেণীর যে দোষ আছে, তাহা আমি স্বীকার করি। আমার অনেক সুদক্ষ, সচ্চরিত্র ও গুণবান্ বন্ধু এই শ্রেণীভুক্ত। ভারত-বাসীদিগের নিকট হইতে আমি অনেক সাহায্য ও উপকার পাই-য়াছি। এই দূরতর দেশে আমি খনও আমার বন্ধু, সহযোগী ও অধীনস্থ লোকের নিন্দা করিব না। তথাপি আমি স্বীকার করি যে, ঐ দলের অনেক দোষ আছে। ঐ সকল দোষ তাঁহা দের অবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল। ঐ অবস্থার উপর তাহাদের কোন রূপ ক্ষমতা নাই। সাধারণ লোকের সহিত তুলনায় এই শ্রেণীর লোকেরা অনেক উচ্চ শিক্ষা পাইয়াছেন। ইহাদের মনে যে, আত্মগরিমার বিকাশ হইবে, তাহাতে কে বিস্মিত হইতে পারে? ইহারা গবর্ণমেণ্টের অধীনে সর্ব্বোচ্চ কার্য্য হইতে বঞ্চিত, ইহাতে ইহারা যে, অসন্তুষ্ট হইবেন, তাহাতে কে বিস্মিত হইতে পারে? ইহারা কৃত্রিম ও বিদেশ হইতে আনীত তরুর ফল। ইহাতে পারিবারিক অনৈক্য প্রযুক্ত যে, ইহারা বিচ্ছিন্ন হইবেন এবং আপনাদের চরিত্র বিপরীত ভাবাপন্ন করিয়া তুলিবেন, তাহাতে কে বিস্মিত হইতে পারে?

ভারতে ইঙ্গরেজী শিক্ষার প্রথম পথপ্রদর্শকগণ এই রূপ দণ্ড

ভোগ করিয়া আপনাদের জ্ঞান ও ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। জাতীয় ও সামাজিক ভাবের শক্তিতে তাঁহাদের চরিত্র বিশুদ্ধ রহিয়াছে। তাঁহারা যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার দোষ হইতে একবারে বিমুক্ত রহিয়াছেন, তাহা নহে, কিন্তু তাঁহারা পাশ্চাত্য সভ্যতার যে সকল গুণ অধিকার করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের দোষাংশ কাটিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি প্রাচীন রীতি নীতি হইতে স্খলিত হওয়াতে এবং পারিবারিক অশান্তি, সামাজিক অনৈক্য, ধর্ম্মসম্বন্ধে গোলযোগ, প্রাচীন ধর্ম্মগত বিশ্বাসে স্থান অধিকার করিতে অক্ষম, ধর্ম্মবিষয়ে এরূপ দুর্ব্বোধ্য যুক্তিবাদ, রাজনৈতিক বিষয়ে ঘোরতর অসন্তোষ, কপটতা ও আত্মবঞ্চনা ঘটাতে তাঁহাদের বড় কষ্ট হইতেছে। এই কষ্টের গুরুত্ব অতিরঞ্জিত করা অসম্ভব।

যাহা হউক, এইরূপ সমালোচনের আর কোন প্রয়োজন নাই। যে সকল ঘটনা আজ কাল ঘটিতেছে, তাহার গুরুত্ব আমি অস্বীকার করি না। এই পরিবর্ত্তনের যুগে ভারতবর্ষে যে সকল অনিষ্ট ঘটিবে, তাহাতে উপেক্ষা করা অথবা বর্ত্তমান অনিষ্ট কম করিয়া বলা, আমার উদ্দেশ্য নয়। যদি রাজা জাতীয় চরিত্র সংগঠন উদ্দেশ্যে উচ্চতর শিক্ষা দান করেন, তাহা হইলে তাঁহার উপযুক্ত কার্য্য হয় না। তদ্দ্বারা মানসিক ও নৈতিক উন্নতির ক্ষতি হয়। উহাতে সামাজিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়া নানা অনিষ্টের উৎপত্তি করে। আমি যাহা বলিতেছি, আমার ভরসা আছে, তাহা সকলে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিবেন। কিন্তু আমি যখন ইষ্টের সহিত অনিষ্টের তুলনা করি, যে উপকার লাভ হইয়াছে এবং যাহা পরে সমুদয় লোকের মধ্যে সম্প্রসারিত

হইবে, যখন তাহা মনে করি, যখন ভাবি যে, ইঙ্গরেজীশিক্ষা ভারতবর্ষে এক কি বড় জোর দুই পুরুষ ধরিয়া চলিতেছে, যখন উহার ফল চারি দিকে প্রত্যক্ষ করিয়া বিচার করি, তখন আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, সহস্র দোষ থাকিলেও ইঙ্গরেজী শিক্ষা দ্বারা এদেশের অনেক উপকার সাধিত হইতেছে।

এই সামাজিক বিপ্লবের সহিত যে, মঙ্গল অনুস্যূত রহিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যে সকল সম্প্রদায় এক্ষণে উহার বাহিরে অবিচলিত রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যেও উহা প্রসারিত হইবে। অধিকন্তু যত্ন ও উদ্‌যোগ ব্যতিরেকে যেমন উহা আপনা আপনি ছড়াইয়া পড়িবে, তেমনই পরিবর্ত্তনজনিত অপকর্ষও কম হইয়া আসিবে। ঐ বিপ্লবে যে অপকার ঘটিবে, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, সকল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে অল্প কি অধিক পরিমাণে অশান্তির সংযোগ রহিয়াছে। হিন্দু সম্প্রদায় পরিবর্ত্তনের মধ্যে এতদূর অগ্রসর হইয়াও যে, বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই, ইহাই আমার নিকট অধিকতর আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়। ঐ সম্প্রদায় নীতিপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া যে, জাতীয় গুণের পরিবর্ত্তে বিজাতীয় দোষ গ্রহণ করিবে, তাহা তত আশ্চর্য্যের নহে। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি আপনাদের পৈতৃক ধর্ম্মে আস্থা শূন্য হইতেছেন, অনেকে প্রাচীন কার্য্যকলাপ অপেক্ষা নব্য কার্য্যকলাপেরই অধিক প্রশংসা করিতেছেন। ইঙ্গরেজী শিক্ষায় স্নেহ ও মমতা, বাধ্যতা, বয়োজ্যেষ্ঠদিগের প্রতি ভক্তি, পিতৃপুরুষদিগের প্রতি সম্মান কমিয়া আসিতেছে—যদি এই সকল দোষ ইঙ্গরেজীশিক্ষার জন্য হয়—তাহা হইলে আমি সাহসসহকারে বলিতেছি যে, সমাজের

নেতারা এবং যে জনসাধারণ তাঁহাদের পরামর্শে পরিচালিত হয়, তাহারা ঐ সকল দোষে লিপ্ত নহে। চিন্তাশীল হিন্দুগণের মধ্যে অনেকেই অদূরদর্শী যুক্তিবাদীদিগের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইয়াছেন। এই যুক্তিবাদিগণ প্রাচীন হিন্দু ঋষি ও ব্যবস্থাপকগণ যে সকল সামাজিক প্রথা প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার নিন্দা করেন। ইঁহারা বর্ত্তমান কালের গৌরববৃদ্ধির জন্য অতীত কালকে হেয় জ্ঞান করেন এবং মানব জাতির মহত্তর অবদানও যে প্রশংসা লাভ করে নাই, ইঁহারা আধুনিক অপরিপক্ক সভ্যতাকে সেই প্রশংসায় মহিমান্বিত করিয়া উহার অকিঞ্চিৎকর গৌরবগীতি গান করিয়া থাকেন। হিন্দু জাতির যে অন্তর্নিহিত স্থিতিশীলতা আছে, তাহা কোনও বিজাতীয় সভ্যতায় বিনষ্ট হইবার নহে। পাশ্চাত্য চিন্তার অনিবার্য্য খরস্রোতের সম্মুখেও হিন্দুর জাতীয় চরিত্র অবিচলিত রহিয়াছে ও আপনার জ্ঞানগৌরবের পরিচয় দিতেছে, তাহাতেই উহার দৃঢ়তার প্রমাণ পাওয়া যায়। উহা নানা প্রকার বিপ্লবের মধ্যেও ধর্ম্মভাবের অন্তঃস্রোত অপ্রতিহত রাখিয়াছে, এবং সামাজিক ও নৈতিক শৃঙ্খলা যে, কেবল ধর্ম্মের উপরে নির্ভর করে, এই দৃঢ় সংস্কার রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

ভারতে ধর্ম্মের গতি।

ভারতে ইঙ্গরেজশাসনের একটি পুরাতন ও সুদৃঢ় নীতি ধর্ম্মবিষয়ে নিরপেক্ষতা। প্রজাদের সহিত আচারব্যবহারের সময় ভারত গবর্ণমেণ্ট ধর্ম্মবিষয়ে সত্যাসত্য বিচার করেন না। গবর্ণমেণ্ট সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অধিনেতাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া থাকেন; এই নীতি অনুসারে পাশ্চাত্য চিন্তার ফল স্বরূপ যে সকল অস্থায়ী ধর্ম্ম ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়, গবর্ণমেণ্ট সে সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না। সত্যবটে, গবর্ণমেণ্ট হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় হইতে যে অর্থ গ্রহণ করেন, তদ্দ্বারা বিশপ, আর্কডিকন্ প্রভৃতি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। ইহাতে গবর্ণমেণ্টকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মবিস্তারের পক্ষপাতী বলা যাইতে পারে। অধিকন্তু খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ভারতবর্ষীয়গণ কিয়দংশে রাজপুরুষগণের অধিকতর প্রিয়পাত্র হইয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট আপন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিশপ ও পাদ্রীদিগকে অনেক সময় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সেনেট সভার সভ্য নিয়োগ করিয়া থাকেন। তথাপি নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, প্রাচীন সময়ের রোমক শাসনকর্ত্তাদের ন্যায় আমাদের ভারত-শাসনকর্ত্তারাও ধর্ম্মবিষয়ে নিরপেক্ষ রহিয়াছেন। স্থূলতঃ বলিতে গেলে গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীদিগকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য কোন চেষ্টা করেন না। ভারতবাসীরাও রাজধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার জন্য কোন রূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন না। যে সকল যুবক বিদ্যালয়ে ইঙ্গরেজী শিক্ষা করেন, যখন হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি

তাঁহাদের শ্রদ্ধার হ্রাস হয়, তখন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম তাহার স্থল অধিকার করে না। আমি এদেশের অনেক ভদ্রলোকের নিকট শুনিয়াছি যে, ভিন্ন জাতির যাজিত ধর্ম্ম বলিয়া কেহ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হয় না।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ ধর্ম্মপ্রচার অপেক্ষা শিক্ষাকার্য্যে অধিকতর ব্যাপৃত রহিয়াছেন। ইঁহারা ছাত্রদের মনে হিন্দু-ধর্ম্মে বিশ্বাস নষ্ট করিয়া অন্য বিশ্বাস উৎপাদনে যত্ন করেন। গবর্ণমেণ্ট কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ ঘোরতর তমোজাল বিস্তার করিতে ভাল বাসেন। বিধ্বংসসাধনই তাঁহাদের কার্য্য। তাঁহাদের শিক্ষায় পুরাতন বিশ্বাস বিনষ্ট হয়, উহার পরিবর্ত্তে আর কিছু না পাওয়াতে মনের স্থিরতা থাকে না, সুতরাং মানসিক ও নৈতিক অবস্থার গোলযোগ ঘটে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম-প্রচারকগণ শৃঙ্খলার সহিত লোকের ধর্ম্মভাব সংগঠিত করিতে ইচ্ছা করেন; তাঁহারা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছেন যে, প্রাচীন হিন্দুপ্রণালী বিনষ্ট হইবে, উহার স্থলে একটি সামাজিক ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মত প্রচার করিতে হইবে। তাঁহারা এই উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়াই কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, ইহা তাঁহাদের প্রশংসার কথা। ইহাতে তাঁহারা ভাল কাজ করিয়াছেন এবং স্বকার্য্যসম্পাদনে যথোচিত সাহসেরও পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে বিফল হইয়াছে। সুদূর দক্ষিণাপথে কাথলিক ধর্ম্ম সম্প্রদায় যেরূপ গভীর ও জলন্ত বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহা আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু এ পর্য্যন্ত যাহা ঘটিয়াছে তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে ভবিষ্যতে যে, অধিক লোক খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, এরূপ বোধ হয় না। যে স্থানে কোন

সর্ব্বাঙ্গীণ ও সম্পূর্ণভাবে সংগঠিত কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে, সেইখানেই খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অধিক পরিমাণ শিষ্য সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছে। মুসলমান ধর্ম্মের সমক্ষে ইহার কোন পরাক্রমই খাটে না। হিন্দুদের মধ্যেও যাহাদের মানসিক ভাবের বিকাশ হয় নাই, এমন নিরক্ষর নিম্নশ্রেণীর লোক * ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট ইহার প্রভাব অনুভূত হয় না। যদিও দুই একজন শিক্ষিত হিন্দু খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন, তথাপি সাধারণতঃ শিক্ষিত হিন্দুসম্প্রদায় বুঝিতে পারিতেছেন যে, ইউরোপের জ্ঞানিগণ ক্রমেই আপনাদের পুরুষপরম্পরাগত ধর্ম্ম হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছেন। ভবিষ্যতে যেরূপ পরিবর্ত্তনই ঘটুক না কেন, লোকে হিন্দু ধর্ম্মের স্থলে যে, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, তাহা কখনও সম্ভব নয়। ভারতবাসিগণ কখনও উহা গ্রহণ করিবে না।

ডাক্তর কন্‌গ্রিব্ ভারতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের পরিণাম এবং ঐ ধর্ম্মের সহিত হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের সম্বন্ধবিষয়ে যাহা বলিয়াছেন,

* একজন কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী যোগ্য লেখক এবিষয়ে সমীচীনতার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন ;—"খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকদিগের কার্য্যের প্রারম্ভেই নীচ জাতির মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্মের উন্নতিতে ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য উচ্চ বর্ণের হিন্দুদিগের শত্রুতা ও বিরোধিতা দশগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। জাতি যে, সমাজ ও ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিভেদের পরিচায়ক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং খ্রীষ্টধর্ম্ম হিন্দুর চক্ষে কেবল ধর্ম্মসংক্রান্ত পরিবর্ত্তন বলিয়া বোধ হয় না, প্রত্যুত উহা এরূপ একটি সামাজিক একাকার ও যথেচ্ছাচার বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে যে, দেশের নিম্ন শ্রেণীর নিকৃষ্ট লোকেরাই উহার অন্তর্ভুক্ত হয়। কোন অভিনব মত প্রচারের সময় এবং সমাজের প্রকৃত পরিচালকদিগের সহকারিতা ব্যতীত জনসাধারণের উপর ক্ষমতা বিস্তারের কালে, সমাজের প্রকৃত পরিচালকদিগকে পরিত্যাগ করা বড় আশঙ্কার স্থল।"

আমি সর্ব্বান্তঃকরণে এই মতের অনুমোদন করি। সামাজিক ও ধর্ম্ম সংক্রান্ত প্রধান প্রধান কার্য্যে যে প্রণালীতে চলা উচিত, উক্ত লেখক সেই প্রণালীর প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়াছেন।

তাহা এরূপ সঙ্গত যে, আমি এস্থলে সে বিষয় উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। তিনি লিখিয়াছেনঃ—

"ভারতে আমাদের দুইটি ধর্ম্ম লইয়া কাজ। একটি হিন্দু ও অপরটি মুসলমান ধর্ম্ম। উভয় ধর্ম্মই এখনও এরূপ প্রবল যে, আমরা কোনটির উপর আত্মমতের প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারি না। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ যদি দর্শনশাস্ত্রের সাহায্যে আপনাদের ধর্ম্মপ্রচারে উদ্যত হন, তাহা হইলে সূক্ষ্মদর্শী ব্রাহ্মণগণ তদ্বি পরীত দার্শনিক মত দ্বারা তাঁহাদের মতখণ্ডনে অগ্রসর হইয়া থাকেন। এ বিষয়ে তর্কবিতর্কের শেষ হয় না, অথচ উহাতে কোন ফলও দেখা যায় না। যদি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকেরা আপনাদের ধর্ম্মের সহজভাব ও ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া লোকের বিবেকের উপর নির্ভর করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে পরাজয়জনিত বিরক্তি সহ্য করিতে হয় না, যুক্তিপ্রণালী নিষ্ফল হইলেও ক্ষোভ প্রকাশ করিতে হয় না। কিন্তু ইহাতেও তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য সফল হয় না, যেহেতু ভারতে যে ধর্ম্মপ্রণালী প্রচলিত আছে তাহাতে সেই ধর্ম্মের উপাসকদিগের কোন অভাবই বোধ হয় না, অভাব বোধ না হইলে কোন অভিনব ধর্ম্মও গ্রাহ্য হইতে পারেনা। গ্রীস ও রোমে পৌত্তলিক ধর্ম্মের সহিত খ্রীষ্টধর্ম্মের যেরূপ সংগ্রাম চলিয়াছিল, এখানে সেরূপ চলেনা। গ্রীস ও রোমের শিক্ষিত সম্প্রদায় দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিয়া পৌত্তলিক ধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন। জনসাধারণও নীতিজ্ঞান লাভ করিয়া উহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে। এজন্যই গ্রীস ও রোমে বহু দেবোপাসনা-পদ্ধতির মূলদেশ ক্ষয়িত হয়। ভারতবর্ষে এরূপ

ঘটনা সম্ভবেনা। চিরন্তন সংসর্গজনিত ভাব ও দীর্ঘকালব্যাপী একতাবন্ধনের যে ক্ষমতা, গ্রীক ও রোমক সম্রাজ্যে চারিশত বৎসরকাল অপ্রতিহত ভাবে ছিল, অসভ্যদিগের আক্রমণে যাহা বিনষ্ট হইয়া যায়, ভারতেও তাহা বর্ত্তমান আছে। ইহা মনে করিলেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সহিত সংগ্রাম করা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকদিগের পক্ষে কতদূর দুঃসাধ্য, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। তখন স্পষ্টবোধ হইবে যে, ইহা একান্ত অসম্ভব।

"অপর যে একটি ধর্ম্মের সহিত আমাদিগকে সংগ্রাম করিতে হয়, তাহার বিষয় অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। এবিষয়ে ইতিহাস যাহা নির্দ্দেশ করিতেছে, তাহা নিশ্চিত ও অখণ্ডনীয়। খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম মুসলমান ধর্ম্মের উপর আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয় না। আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টাও ক্রমে তাহাকে নীরবে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। মধ্যযুগে এই দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী একেশ্বরবাদের মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষ হইয়াছিল, এই সংগ্রামের ফল অনিশ্চিত হয় নাই। গ্রীসে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম পরাজয় স্বীকার করে। ইতালির খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম কেবল আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়, উহা ইহার অধিক আর কিছুই করিতে পারে নাই। এই উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম্মই মানবজাতির একমাত্র সত্য ধর্ম্ম বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেয়। কিন্তু উভয়েই উভয়ের মত হেয় জ্ঞান করে। উভয়েই উভয়ের পার্শ্বে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহাতে আমাদের স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, উভয়েই আপনাদের ন্যায্য প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক বিষয়ের দাবী করিয়াছিল।"

কোমৎ তাঁহার প্রণীত প্রশ্নোত্তরের ভূমিকায় এইকয়েকটি হৃদয়স্পর্শী সারগর্ভ কথা লিখিয়াছেনঃ—

"পাঁচশত বৎসর হইল, মুসলমানেরা ইউরোপজয়ের আশা পরিত্যাগ করিয়াছে।" কাথলিক ধর্ম্মসম্প্রদায় আপনাদের চির-শত্রু মুসলমানদিগের হস্তে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রবর্ত্তকের সমাধিস্থান পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়াছে। এই উভয় ধর্ম্মই সমগ্র রোমক সাম্রাজ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। উক্ত সাম্রাজ্য পরস্পরবিরোধী এই উভয় একেশ্বরবাদের মধ্যে সমভাগে বিভক্ত হইয়াছে।"

কর্ণেল অস্‌বোর্ণ আর এক হিসাবে খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকদিগের অকৃতকার্য্যতার সম্বন্ধে এইরূপ যথার্থ কথা বলিয়াছেনঃ—

"ইঙ্গরেজ ও ভারতবাসীদিগের মধ্যে বর্ত্তমান অপূর্ব্ব সম্বন্ধেই খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকদিগের স্বকার্য্যের ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। ইঙ্গরেজরা এদেশের শাসক বটেন, কিন্তু তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ জীবনের সহিত এদেশের জনসাধারণের কোন সংস্রবনাই। অর্থাৎ ভারতবাসী-দিগের উপর ভারতপ্রবাসী ইঙ্গরেজদিগের অনুরাগ নাই, বন্ধুত্বের বিকাশ নাই, তাঁহাদের কেহ কেহ কর্ত্তব্যপালনের অনুরোধে এদেশবাসীদিগের সহিত একত্র হন। কিন্তু এতদ্দেশীয়দিগের মানসিক ও সামাজিক অভাব মোচনের জন্য তাহাদের স্বদেশীয়-গণই পর্য্যাপ্ত। সহস্রের মধ্যে এরূপ একজনও ইঙ্গরেজ দেখা যায় না, যিনি ভারতবর্ষের নিকট চিরবিদায় গ্রহণসময়ে আপনার পরিচিত কোন ভারতবাসী হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে হৃদয়ের একস্থান শূন্য বোধ করেন। মনের এরূপ অবস্থা অপেক্ষা ধর্ম্মপ্রচারের আর কি অধিকতর বিঘ্ন ঘটিতে পারে? প্রকৃতির যে কমনীয় ভাব থাকিলে সমস্ত পৃথিবী আপনার বলিয়া বোধ হইতে পারে, এখানে তাহারই অভাব দেখা যাইতেছে। এই অভাব

ইঙ্গরেজ রাজপুরুষদিগের মধ্যে যেরূপ, ইঙ্গরেজ ধর্ম্মপ্রচারক-দিগের মধ্যেও সেইরূপ দেখা যায়। * * * * এই উদাসীনতার সহিত সেণ্টপলের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদিগের প্রতি উক্ত মহাত্মার হৃদয়গত মহান্ ভাবের তুলনা করিলে, রোমক সাম্রাজ্যের সমকালে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম যেরূপ পরিপুষ্ট হইয়াছিল, ভারতবর্ষে কেন সেরূপ হইতেছে না, তাহা অনায়াসে বুঝা যাইবে"।

উল্লিখিত মতের উপর আমার অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে আমি দেখিয়া শুনিয়া, এই মাত্র বলিতেছি, যে, ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তাঁহারা উহার অনুশাসনের প্রতি অধিকতর বিরাগ দেখাইতেছেন, এবং উন্নতিশীল নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে উহার প্রচারের গতিরোধেও যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতেছেন। খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরোধী গ্রন্থ ও সাময়িক পত্র সকল প্রচারিত হইতেছে। উহা হিন্দু ও মুসলমানগণ আগ্রহের সহিত কিনিয়া লইতেছে। যেমন শিক্ষার বিস্তার হইতেছে, তেমনই দেশের লোকে একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আপনাদের অরুচিকর ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে, এইজন্য পূর্ব্বে যেমন লোকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইত, এখন আর সেরূপ হয় না, কেবল কখন কখন দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকে এবং ভারতের আদিম অধিবাসীরা ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। আমি বঙ্গদেশে আঠার বৎসরকাল আছি। এই সময়ের মধ্যে কোন ভদ্র সন্তান খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন, এমন আমার স্মরণ হয় না।

যাহা হউক, শিক্ষিত হিন্দুগণ খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত না হইলেও

তাঁহাদের বিশ্বাস যে, সর্ব্বোপরি একজন শাসনকর্ত্তা আছেন। হিন্দুদিগের মন স্বভাবতই ধর্ম্মপরায়ণ। তাঁহাদের পূর্ব্বতন ধর্ম্মের ইতিহাসে যাহা পাওয়া যায়, তাহা ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্মদ্বারা তাঁহারা আপনাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিতে প্রস্তুত নহেন। এজন্য চিন্তাশীল হিন্দুদিগের অধিকাংশই প্রকৃতির অতীত কিছু আছে, ইহা বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহারা কোন না কোন আকারে একেশ্বরবাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং উহা তাঁহাদের প্রাচীন শাস্ত্রীয় ধর্ম্ম মনে করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত ও সজীব করিতে যত্ন করেন। তাঁহারা আবার এই ধর্ম্মমতের সহিত পৌত্তলিকতার অনুমোদিত কার্য্যকলাপের সামঞ্জস্য করিয়া লন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, ঐ কার্য্যকলাপ পরম্পরাগত লোকাচারের সঙ্গে নিবদ্ধ রহিয়াছে। উহাতে কোন দোষও দেখা যায় না। শিক্ষিত সম্প্রদায় ও জনসাধারণের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা উহাদ্বারা দূর হইতে পারে। তাঁহাদের এই কার্য্যে অতি উদারতা ও সহিষ্ণুতার সমাবেশ হয় এবং ইহাতে কিছু অসঙ্গত বিষয় নাই, যেহেতু এক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ বহুবিধ শক্তির উপর আধিপত্য করিতেছেন—এইরূপ বিশ্বাস, আর বহুবিধ দেবতা বহুবিধ সীমাবদ্ধ স্থানে ক্ষমতা বিকাশ করিতেছেন—এইরূপ বিশ্বাস, এই উভয়ের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ নাই। ঐ সকল ব্যক্তি যুক্তিবাদের সহিত হিন্দুধর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে যত্ন করেন। তাঁহাদের এই কার্য্যের প্রকৃত ভাব সকলে বুঝিতে পারে না। সময়ে সময়ে উহার অপব্যবহারও দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য কোন কোন উৎসাহপূর্ণ লোকের নিকট উহা নিতান্ত অপ্রীতিকর হইয়া

উঠে। তাঁহারা কিছুতেই উভয় মতের মধ্যবর্ত্তী থাকিতে প্রস্তুত হন না। যে ধর্ম্মমত জনসাধারণের মধ্যে প্রসারিত রহিয়াছে, তাঁহারা তাহা অসত্য ও অনিষ্টকর বলিয়া, পৌত্তলিকতা অথবা কুসংস্কারের সর্ব্বপ্রকার চিহ্ন হইতে আপনাদিগকে বিমুক্ত রাখাই প্রধান কার্য্য মনে করেন। এই প্রকার লোক হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি হইয়াছে।

ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ নাই। প্রত্যুত ঐ সম্প্রদায়ের অনেকের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে। বিশেষ যে শক্তিতে মানুষ জনসাধারণের প্রকৃত শিক্ষক হইতে পারে, সেই শক্তিতে গৌরবান্বিত ব্রাহ্ম অধিনেতারা আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধার পাত্র। আমি স্বয়ং ব্রাহ্মদের উপাসনাপদ্ধতি দেখিয়াছি। হিন্দুর মনে ধর্ম্মভাবের যতদূর গভীরতা সম্ভবে, ঐ উপাসনায় ততদূর গভীরতা লক্ষিত হইয়াছিল। যাহারা সন্দেহের আবেগময় তরঙ্গে নিমজ্জিত হইত, ব্রাহ্মধর্ম্ম যে, তাহাদিগকে নিরাপদ করিয়াছে, তাহা আমি অস্বীকার করিনা। উহা তাহাদের উচ্চাশা সকল চরিতার্থ করিয়াছে এবং তাহাদের জীবনযাত্রার প্রণালী উন্নত করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম আমার নিকট একটি নিশ্চিত বিশ্বাসমূলক ধর্ম্ম বলিয়া বোধ হয় না। উক্ত ধর্ম্মমত সাধারণের অধিগম্য নয়। ইউরোপের একেশ্বরবাদের সহিত ঐ ধর্ম্মের মূল বিষয়ের কোন প্রভেদ নাই। উহা ব্যক্তিগতধর্ম্ম; ঐ ধর্ম্মের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মপরীক্ষা করা যেরূপ আবশ্যক, সমাজের সকলের আত্মপরীক্ষার ফলের সামঞ্জস্য বিধান করাও সেইরূপ আবশ্যক। উহাতে যে সকল দার্শনিক তত্ত্ব আছে, তাহা একটি বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে প্রচারিত হইতে পারে। কিন্তু ঐ শ্রেণী

সর্ব্বদাই অতি সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাকিবে। সাধারণ লোকের প্রকৃতিই এই যে, স্বাধীন চিন্তাদ্বারা তাহারা আপনাদের মতঃস্থির না করিয়া অপরের নিকট হইতে উহা গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহারা এমন শিক্ষক চায় যে, যাঁহারা স্বর্গীয় পুরুষের ন্যায় শিক্ষা দিতে পারেন, কিংবা যাঁহাদিগকে ঈশ্বরের আদেশপ্রচারক বলিয়া বিশ্বাস হইতে পারে; অথবা যাঁহারা মানবজাতির বহুকালের সঞ্চিত জ্ঞানের যথার্থ ব্যাখ্যা করিতে পারেন। যদি প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীন চিন্তাদ্বারা মূল বিশ্বাস স্থির করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে ঐ প্রক্রিয়া যে, ভ্রমশূন্য হইবে, অথবা সকলেই যে এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন, তাহার কিছু স্থিরতা নাই। নানা ব্যক্তির আত্মচিন্তা যে পরিমাণে এক হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্মও সেই পরিমাণে সংগঠিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু এইরূপ একতা অতি অল্প লোকের মধ্যেই হইয়া থাকে। যে ধর্ম্ম-পদ্ধতি বিশেষ সূক্ষ্ম বুদ্ধির অধিগম্য নয়, যাহাতে অধিক পরিমাণে মানবীয় ভাব আছে, জনসাধারণের পক্ষে সেইধর্ম্মই আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে আজকাল অনেক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। উন্নত ব্রাহ্মগণ একেশ্বরবাদের অনুরূপ বিশুদ্ধ প্রণালীতে উপাসনাকার্য্য করিবেন, বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের যে যে বিষয়ে কৃতকার্য্যতা লাভ হইয়াছে, তাহাতে তাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় দার্শনিক মত রক্ষা করিতে পারেন নাই। এবিষয়ের বিরুদ্ধে কিছু তর্কবিতর্ক না করিয়া তাঁহারা স্বীকার করিলে ভাল হয় যে, ধর্ম্মসম্বন্ধে ঐশ্বরিক ভাবের মধ্যে মানবীয় ভাব নিবেশিত করা আবশ্যক। এই নীতির অনুসরণ করিলে এবং মূলতত্ব ও অনুশীলনপদ্ধতি উদার

ভাবে পরিবর্ত্তিত করিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম নিম্নশ্রেণীর অল্পশিক্ষিত লোকের মধ্যে প্রসারিত হইতে পারে। এক্ষণে উহা যে আকারে আছে, তাহাতে উহা একটি সাময়িক ধর্ম্মরূপে সমস্ত জাতিকে বর্ত্তমান সময়ের সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে না। প্রাচীন ধর্ম্মপদ্ধতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ত দূরের কথা।

যে যোগবিদ্যার (থিয়সফির) মত কিছু দিন হইতে প্রভাব বিস্তার করিতেছে, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ন্যায় তাহারও দার্শনিক মূলে ব্যক্তিগত ভাব আছে। উহার প্রকৃত তত্ত্বের সূক্ষ্মতা এবং উহার আধ্যাত্মিক ভাব, অপ্রাকৃতিক শক্তি ও লিঙ্গশরীর কল্পনা-শক্তির উদ্দীপক। এই সকল বিষয় হিন্দুদিগের মানসিক ভাবের অনুকুল। থিয়সফির মতের সহিত ব্রাহ্ম ধর্ম্মতত্ত্বের সাদৃশ্য আছে এবং উহা হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতারও বিরোধী নহে। ভারতবাসিগণ দেখিতেছেন, যেন কোন অভাবনীয় শক্তিতে থিয়সফির পক্ষপাতী ইউরোপীয়গণ আপনাদের পূর্ব্ব-তন উদাসীনতা ও বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিয়া এদেশের লোকের সহিত প্রগাঢ় সমবেদনা দেখাইতেছেন; এই সকল কারণে ভারতবাসীদিগের মধ্যে থিয়সফিপ্রচারের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। নানা কাল্পনিক মতের অভিঘাতে ইতস্ততঃ আন্দোলিত হইয়া ভারতবাসিগণ অবশেষে এই রহস্যময় অমা-নুষিক ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের আগ্রহে বুঝা যায় যে, এখন তাঁহাদের মধ্যে কোন জ্ঞানগর্ভ সন্তোষজনক ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু ক্রমে উক্ত ধর্ম্মের প্রতি উৎসাহের হ্রাস হইয়াছে। উক্ত ধর্ম্মের অধিনেতা-দের কোন কোন বিষয় সাধারণ্যে প্রচারিত হওয়াতে শিষ্যগণ

হৃদয়ে বড় আঘাত পাইয়াছেন। কেহ কেহ উক্ত ধর্ম্মমতও পরিত্যাগ করিয়াছেন। যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পরিমাণ উনবিংশতি শতাব্দীর ইঙ্গরেজেরা বুঝিতে পারেন না, যদিও তাঁহাদের সেইরূপ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে, তথাপি যে ঘটনার কোন প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে না, যাহা বিশ্বস্ত প্রমাণ অনুসারে চাতুরীর বলে রক্ষিত বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে দীর্ঘকাল অটলভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা সহজ নয়।

এই সকল ধর্ম্মমত অথবা দার্শনিক মত অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট অগস্ত্ কোমতের উপদেশ ভারতের অনেকস্থানে বিশেষ বঙ্গদেশে অধিক পরিমাণে গৃহীত হইয়াছে। আমি স্বীকার করি যে, আপাত দৃষ্টিতে বোধ হয়, কোমতের প্রত্যক্ষবাদ ও হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে দুরতিক্রমণীয় পার্থক্য আছে। হিন্দুগণ কেবল প্রত্যক্ষ বিষয়ে নয়, কিন্তু অতিস্বস্তু ও কল্পনামাত্র বিষয়ে এতদূর বিশ্বাস স্থাপন করেন যে, যে প্রত্যক্ষবাদ প্রকৃতির সম্বন্ধে প্রহেলিকা ভঞ্জন করা মানববুদ্ধির অগম্য বলিয়া প্রকাশ করে, সেই ধর্ম্মের প্রতি তাঁহারা কিরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিবেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। শীঘ্রই হউক, বা বিলম্বেই হউক, একসময়ে ইউরোপখণ্ডের ন্যায় ভারতবর্ষেও প্রত্যেক ঘটনায় যুক্তির বিকাশ দেখা যাইবে। ইচ্ছার স্থলে নিয়মের প্রাধান্য লক্ষিত হইবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে সমাজিক ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয়ে অপ্রাকৃত বিষয়ের পরিবর্ত্তে প্রকৃত বিষয়ের আবির্ভাব হইবে। কোমতের উপদেশ বাঙ্গালার কতিপয় ব্যক্তির হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। প্রথমেই অনেক লোকের মধ্যে প্রত্যক্ষবাদ প্রচার হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। যাঁহারা উহার বিশেষ বিশেষ মত বুঝিয়া

উঠিতে পারেন না, তাঁহারা প্রায়ই উহার বিপরীত অর্থ ধরিয়া থাকেন। ঐ মত যদি কেবল বৈজ্ঞানিক শক্তির অনুরোধে গৃহীত হয়, তাহা হইলে উহাদ্বারা বর্ত্তমান সামাজিক দুর্নীতি ও অশান্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। স্থূলদর্শী সমর্থনকারী ও অসাবধান প্রশংসাকারী অপেক্ষা দুর্দ্দমনীয়ও শত্রু ভাল। শত্রুগণ যে অযথা ব্যাখ্যা করে, তাহাতে তত ক্ষতি নাই, যেহেতু উহার প্রতিবাদ করা যাইতে পারে। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল স্বপক্ষদিগের অক্ষোৎসাহ সহজে দমন করা যায় না। সুতরাং উহাতে অনেক অনিষ্ট ঘটিতে পারে। প্রত্যক্ষবাদে অনন্তকালে শাস্তির ভয় বা পুরস্কারের আশা নাই। এজন্য তাড়াতাড়ি করিবারও প্রয়োজন নাই। অতীতকালে প্রাচীন ধর্ম্ম মত দ্বারা জনসমাজ প্রকৃষ্টরূপে শাসিত হইয়া আসিয়াছে। প্রত্যক্ষবাদ দ্বারা হৃদয় ও বুদ্ধি কিরূপে বিকশিত হইয়াছে, তাহা দেখাইতে পারেন, এরূপ একটি ক্ষুদ্র প্রচারকমণ্ডলী যে পর্য্যন্ত ইউরোপের উন্নত জাতির মধ্যে সংগঠিত না হয়, সে পর্য্যন্ত প্রাচীন ধর্ম্ম মত আরও কিছুদিন থাকিতে পারে। কোন সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের সহিত যে পর্য্যন্ত উহা অপেক্ষা বিশুদ্ধ নীতির সংঘর্ষ না হয়, সে পর্য্যন্ত ঐ ধর্ম্ম বিনষ্ট হয় না। এই নিমিত্ত সাধারণ লোকে যে পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষবাদের অনুশীলনে উহার নৈতিক ফলের বিকাশ না দেখিবে, সে পর্য্যন্ত যে, ঐ ধর্ম্মকে আপনাদের জীবনের নিয়ামক স্বরূপ গ্রহণ করিবে, তাহা আশা করা যায় না।

পক্ষান্তরে স্বধর্ম্মরত হিন্দুগণ যেরূপ নীতি পালন করেন, প্রত্যক্ষবাদের সহিত তাহার অনেক সাদৃশ্য আছে। সম্প্রতি

একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে *। ঐ পুস্তকে চৈতন্যের ধর্ম্মনীতির সহিত কোমতের নীতির সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। চৈতন্যের মতে অনাসঙ্গ বা নির্লেপ জীবনের সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য। কিন্তু যোগিগণ, বৌদ্ধগণ, শৈবগণ এবং বৈদান্তিকগণের মতে উহাই জীবনের চরম লক্ষ্য। কোমতের ধর্ম্মপ্রণালীতেও চৈতন্যপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের অনুরূপ উপদেশ আছে। কোমৎ সাধারণ ভাবে আত্মত্যাগকে অন্যান্য ধর্ম্মভাব পরিপুষ্ট করিবার জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়াছেন। উভয় ধর্ম্মপ্রণালী সন্তানের প্রতি পিতামাতা যেরূপ স্নেহ প্রকাশ করেন, সেইরূপ কোমল সদয়ভাব প্রধান বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু কোমতের মতে অনুরাগ ভক্তির পূর্ব্বে। ইউরোপে স্বামীস্ত্রীর ভালবাসার দৃষ্টান্ত দেখিয়া কোমৎ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে চৈতন্য ভারতের পারিবারিক অবস্থা দেখিয়া অনুরাগের পূর্ব্বে ভক্তির অনুশীলন করিবার উপদেশ দিয়াছেন। এই সাদৃশ্য ভারতের অল্পসংখ্যক প্রত্যক্ষবাদীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ক্ষয়োন্মুখ আধিপত্যের বা যুক্তিবাদীদিগের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হওয়া প্রত্যক্ষবাদীদিগের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন।

* শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রণীত চৈতন্যের ধর্ম্মনীতি নামক প্রবন্ধ।
চৈতন্য প্রাচীন হিন্দুমতাবলম্বী ধর্ম্ম সংস্কারক। খ্রীঃ ১৪৮৬ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। চৈতন্যের মতাবলম্বীরা এখন বঙ্গদেশের হিন্দুসমাজের একটি প্রধান শাখা। হিন্দুগণ নিয়মিত পাঁচটি সুবিদিত সম্প্রদায়ের কোন একটির অন্তর্ভুক্ত (১) সৌর (সূর্য্যের উপাসক); (২) গাণপত্য (গণেশের উপাসক); (৩) শৈব (শিবের উপাসক); (৪) বৈষ্ণব (বিষ্ণুর উপাসক); (৫) শাক্ত (শক্তির উপাসক)। বঙ্গের হিন্দু সমাজের উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিগণের অধিকাংশ শাক্ত। কিন্তু সমাজের অধিকাংশই বৈষ্ণব। বৈষ্ণবগণ চৈতন্যের উপদেশ অনুসারে চলেন এবং চৈতন্যকে বিষ্ণুর অংশবিশেষ বলিয়া মনে করেন।

প্রত্যক্ষবাদ ভারতে বহুকাল বিদেশানীত বৃক্ষের ন্যায় থাকিবে। চৈতন্যপ্রচারিত ধর্ম্ম যেরূপ হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের পরিণামবাদের শেষ ফল, সেইরূপ প্রত্যক্ষবাদও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের পরিণামফল। প্রত্যক্ষবাদীরা বুঝিতেছেন যে, এই উভয় ধর্ম্মদ্বারাই পূর্ব্ব ও পশ্চিম একদিন পরস্পর সম্বদ্ধ হইবে। যে আংশিক একতা পরে হিন্দুদিগকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া তুলিবে, তাহার পরিপুষ্টি করা, আর যে যে বিষয়ে হিন্দুদিগের মধ্যে বৈষম্য আছে, তাহার উদ্দীপন না করাই প্রত্যক্ষবাদীদের এখন প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত।

সকল ধর্ম্মের সহিত প্রত্যক্ষবাদের সম্বন্ধ থাকাতে উহা প্রচারের বিশেষ সুবিধা আছে। উহার অনুশাসনসমূহ অতীত কালের ধর্ম্মের বিরোধী নহে, বরং সকল দেশের প্রধান প্রধান ধর্ম্মের প্রতি উহা সম্মান দেখায়। ঐ সকল ধর্ম্মে যাহা ভাল আছে, প্রত্যক্ষবাদ তাহা বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া গ্রহণ করে। পরিবারের মধ্যে বিবাদ উৎপাদন বা বন্ধুদের মধ্যে অসদ্ভাব সংগঠন করা প্রত্যক্ষবাদের অনুমোদিত নহে। প্রত্যক্ষবাদ গ্রহণ করিলে সামাজিক আচারব্যবহার বা রীতিনীতি পরিত্যাগ করিতে হয় না। ইহা কাহাকেও পূর্ব্বতন বা জীবনের অভ্যস্ত বাহ্য ব্যবহার হইতে একবারে বিচ্ছিন্ন করে না। উদারতামূলক প্রত্যক্ষবাদ ধর্ম্মের সমবেদনা অতি প্রশস্ত। যাঁহার প্রণীত চৈতন্যের ধর্ম্মনীতি নামক গ্রন্থের বিষয় আমি পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই বিখ্যাত হিন্দু প্রত্যক্ষবাদী * উপস্থিত বিষয়ে তাঁহার স্বদেশীয়দিগকে এইরূপ বলিয়াছেনঃ—

* বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। ১৮৮৪ অব্দের ৩০ শে ডিসেম্বর ইনি পর-

"আমাদের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে আমাদের অতীতকালের ইতিহাসের ঘটনার ফল যে, আমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে না, এরূপ আশা বা ইচ্ছা করা উচিত নহে। আমাদের অবস্থা অপেক্ষা যদিও আমাদের চিন্তা উন্নত হইতেছে, তথাপি কেবল উচ্চাশা দ্বারা পরিচালিত হওয়া আমাদের পক্ষে ধর্ম্মসঙ্গত নয়। কারণ সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গলভূত প্রত্যক্ষবাদের জন্য যদিও আমরা পূর্ব্বতন ঘটনা পরিত্যাগ করিতে পারি, তথাপি, সেই পূর্ব্বতন বিষয় বর্ত্তমান সময়ে যাহাদের মধ্যে

লোকগতদিগের সন্তর্পণ উৎসবে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতে এইরূপ বলিয়াছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি প্রত্যক্ষবাদী স্বর্গীয় দ্বারকানাথ মিত্রও এইরূপ মত পরিপোষণ করিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে বিলাতের প্রত্যক্ষবাদী ডাক্তর কনগ্রিব বলিয়াছেনঃ—"তিনি সন্তুষ্টচিত্তে এবং আপনার বিশ্বাস অনুসারে নিজের অন্তোষ্টিক্রিয়া হিন্দু-পদ্ধতি অনুসারে সম্পাদন করিতে বলিয়াছিলেন। যখন তিনি সংশয়বাদ ত্যাগ করিয়া প্রত্যক্ষবাদ গ্রহণ করেন, তখন সমস্ত ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয় পুনর্ব্বার পরীক্ষা করেন, এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের অবলম্বিত প্রথা সকল পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন। ঐ সকলের মধ্যে কি কি ভাল বিষয় আছে, তাহা জানাই, তাঁহার ঐরূপ পরীক্ষা ও আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল। সহসা হিন্দুধর্ম্ম বিনষ্ট না করিয়া ক্রমে ক্রমে উহার পরিবর্ত্তন ও পরিচালনের ইচ্ছায় তিনি ধীরতা ও সহিষ্ণুতার পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি নিজের অভিমত গোপনে রাখিতেন না। যাঁহারা তাঁহার মতের অনুমোদন করিতেন, তাঁহারা যখন তাঁহার চারিদিকে থাকিতেন তখনও তিনি তাঁহার পরিবারিক সম্বন্ধ অনুসারে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতি সম্মান দেখাইতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার সমস্ত গার্হস্থ্য জীবন বোধ হয়, এই নীতিতেই নিয়মিত ছিল। এস্থলে ইহা উল্লেখ করা উচিত যে, তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন তাঁহার সন্তানাদিও ছিল। তথাপি তিনি পরিবারের মধ্যে মাতার আধিপত্য অক্ষুন্ন রাখিতেন। মৃত্যুকালেও তিনি স্পষ্টবাদিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। সেই সময়ে গেডিস্ সাহেবের হস্তে আপনার হস্ত রাখিয়া প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত তিনি যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা এই সকল বিষয়েরই সমর্থন করিতেছে, সাধারণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তিনি হিন্দুধর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বন করিতেন। এরূপ করা ন্যায়সঙ্গত।"

প্রতিফলিত রহিয়াছে, অর্থাৎ আমাদের যে সকল স্বদেশবাসী ইউরোপীয় শিক্ষা পায় নাই এবং বহুকাল প্রাপ্ত হইবে না, তাহাদিগকে আমরা কখনও পরিত্যাগ করিতে পারিব না; আমরা কখনও আমাদের সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইব না, ররং যে চারিকোটী লোক আমাদের চারিদিকে বাস করে ও বাঙ্গালা ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে, তাহাদের প্রতি আমরা স্নেহ ও অনুরাগ দেখাইব। আমাদের বিচারে আমাদের এই সকল স্বদেশবাসী যতই অনুন্নত হউক না কেন, ইউরোপীয়দিগের সহিত একত্র বাসের অনিশ্চিত লাভের জন্য আমরা তাহাদের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিব না। প্রত্যক্ষবাদ আমাদিগকে কখনও এইভাবে পরিচালিত করে না।"

উক্ত লেখক, পরিবর্ত্তনের যুগে যে সকল হিন্দু প্রথমে প্রত্যক্ষবাদ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন ঃ—

"দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদিগকে অনেক প্রতিকূল ঘটনার সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। ইউরোপীয় শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়াতে আমাদের ক্ষমতার এরূপ হ্রাস হইয়াছে যে, কোমৎ যাহা জাতীয় সংস্কার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমাদের স্বদেশবাসীদিগের সেই সংস্কার আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। যদিও আমরা তাহাদের মধ্যে বাস করিতেছি, তথাপি ইঙ্গরেজী শিক্ষার প্রভাবে আমরা জাতীয়ভাব হইতে দূরে অপসারিত হইতেছি। এজন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যতীত আমাদের ঐ সকল ভাব কিরূপে প্রত্যক্ষবাদের দিকে অগ্রসর হইতে পারে, তাহা আমরা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। ঐ সকল ভাবের উন্নতি সাধনেও আমরা অধিকতর অসমর্থ। অধিকন্তু পরাধীনতা

আমাদের একটি প্রধান অন্তরায়। কারণ ইহাতে পাশ্চাত্য বিষয়ের ক্ষমতা আমাদের দেশে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ঐ বিভিন্ন প্রকৃতির ক্ষমতা ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া বিপ্লবের সূত্রপাত করাতে আমাদের পথ অধিকতর কণ্টকিত হইয়াছে। যত দিন উহার শেষ না হইতেছে এবং যত দিন আমরা আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য অশান্তি হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ না হইতেছি, তত দিন আমরা আমাদের জাতীয় সংস্কারের মূল তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হইব না।

"তথাপি আমাদের আত্মবিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। আমরা পরাধীন। হিন্দুসমাজ আমাদের আশ্রয়স্থল। তথাপি আমরা প্রত্যক্ষবাদী হইতে সাহসী হইতেছি। আমাদিগকে এই ভাবেই জীবন ধারণ করিতে হইবে এবং এই ভাবেই জীবনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। আমরা পরাধীন, আমরা হিন্দু এবং আমরা প্রত্যক্ষবাদী। আমাদের ধর্ম্মবীজ কোথায় রোপণের সুবিধা আছে, তাহা আমাদিগকে দেখিতে হইবে। বর্ত্তমান বিষয়ের জটিল ভাব পরিত্যাগ করিলে এই বলা যায় যে, এক্ষণে আমাদের নিজ নিজ জীবন সংগঠনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। কারণ যদি আমরা সমাজমধ্যে থাকিয়া ও গবর্ণমেণ্টের বাধ্য হইয়া যথার্থ প্রত্যক্ষবাদীর জীবন দেখাইতে পারি, তাহা হইলে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, উভয় কালের জন্য একটি মহৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইবে। যদি আমাদের জীবনে দুইটি বিভিন্ন মত অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্ম ও প্রত্যক্ষবাদ, মিলাইয়া লইতে পারি, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে একতাস্থাপনরূপ একটি গৌরবজনক কার্য্য সংসাধিত হইবে।"

ইহা বিজ্ঞতার কথা। সবল ও স্বাভাবিক ভাবে পরিপূর্ণ। ইহার উপর আমার কোন কথা বলিবার নাই। প্রত্যক্ষবাদ যে, অন্যান্য ধর্ম্মের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করে, ইহাতে এক দিকে যেমন তাহাই দেখান হইয়াছে অপরদিকে তেমনই অভি-নব ধর্ম্মাবলম্বীদিগের যে দৃষ্টান্তপূর্ণ জীবন সর্ব্বপ্রকার উপদেশের অতীত, যাহা না হইলে সমুদয় উপদেশ বিফল হয়, তাহারই প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে।

হিন্দুগণ আপনাদের প্রাচীন বিশ্বাস হারাইয়া নাস্তিক, হিন্দু একেশ্বরবাদী, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টীয়, থিয়সফি এবং অবশেষে প্রত্যক্ষবাদ, ইহার একটি না একটি মত অবলম্বন করে। তাহারা আপনাদের ধর্ম্মানুগত সংস্কার পরিত্যাগ করে না বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন প্রবল ধর্ম্মমতের চিহ্ন দেখা যায় না। মেষপালকবিহনে যেরূপ মেষপাল বিচরণ করে, সেইরূপ তাহারাও এদিকে ওদিকে ধর্ম্মান্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। ভবিষ্যতে কি হইবে, বলিতে পারা যায় না। শীঘ্র যে, কিছু হইতেছে না তাহা নিশ্চয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, পৃথিবীর অন্যান্য লোকের ন্যায় প্রাচ্যদেশবাসী এক দিন ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মভাব পরিত্যাগ করিয়া একবিধ ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিবে। পূর্ব্বদেশবাসিগণ যে, এক সময়ে উন্নত হইয়া পাশ্চাত্যদেশ-বাসীদিগের সহিত এক সমভূমিতে দাঁড়াইবে এবং মানব-মনে যে ধর্ম্মের ভাব নিহিত আছে, সেই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক আপনাদিগের জাতীয় উচ্চাশার পরিচয় দিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতে ঐ নৈতিক অবস্থা যদিও ঘোরঘনঘটায় আচ্ছাদিত, তথাপি প্রাচীন খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকেরা যেরূপে ধর্ম্ম

প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে অনেক আশার সঞ্চার হয়। বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টদ্বারা এ বিষয়ে কোন উপকার হইবে না, যেহেতু এই গবর্ণমেণ্ট দেশের লোক হইতে বিচ্ছিন্ন এবং জাতি-ভেদ ও পৌত্তলিক ভাবের প্রতি সমবেদনাশূন্য। শিক্ষাবিভা-গেরও এমন বল নাই যে, দেশের লোকের আচার, ব্যবহার ও চিন্তার স্রোত বিপর্য্যস্ত করিতে পারে। হিন্দুদিগের বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখিয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারক বা অন্য ইঙ্গরেজদেরও সম-বেদনার আবির্ভাব হয় না। কিন্তু চীন দেশে এবং দক্ষিণ ভারত-বর্ষে জেস্যুইট সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকেরা যেরূপ অসা-ধারণ পরিশ্রমের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করা সম্ভাবিত বোধ হয়। যদি তাঁহাদের ধর্ম্ম-মত অপেক্ষাকৃত অধিগম্য হইত, তাহা হইলে লোকের মধ্যে উহা প্রচার করা এত দুরূহ হইত না। অকৃতকার্য্য হইলেও তাঁহারা একটি মহৎকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। কেন না পরবর্ত্তী ধর্ম্মপ্রচারকেরা তাঁহাদের অবলম্বিত পথ অনুসরণ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে সেণ্ট্ ফ্রান্সিস্ জেবিয়রের চেষ্টায় ভারতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বিশেষ আকার পরিগ্রহ করিয়াছে। ফ্রান্সিস্ জেবিয়র প্রধানতঃ সাধারণ লোকের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, উচ্চ জাতির হিন্দুদিগকে স্বধর্ম্মে আনিবার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা করেন নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রবর্ট ডি নোবিলি নামক এক জন জেস্যুইট পাদ্রী দেখিলেন যে, উচ্চশ্রেণীর সহায়তা পাওয়া অতি আবশ্যক, এজন্য ব্রাহ্মণগণের নিকট ব্রাহ্মণ হইয়া সেণ্টপলের ন্যায় ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করি-

লেন। তিনি ও তাঁহার সহযোগিগণ হিন্দু নাম গ্রহণ করিলেন এবং পাশ্চাত্যদেশ-জাত উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ যাজক বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিতে লাগিলেন।

"তাঁহারা ধন, মান, মর্য্যাদা আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধব, সকল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সংসারের কিছুতেই তাঁহাদের স্পৃহা ছিল না। আহার পরিচ্ছদ প্রভৃতি জীবন রক্ষার প্রয়োজনীয় বিষয়েও তাঁহারা কষ্ট স্বীকার করিযাছিলেন। শরীরের প্রতি যত্নকরাও তাঁহাদের পক্ষে বিরক্তিকর বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

* * * *

"তাঁহারা সকল ধর্ম্মাবলম্বীরই দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহাদিগকে দেখিয়া আমাদেব উন্নতির দিকে অগ্রসর হওযা উচিত। উৎসাহবিহীন লোকদিগের দৃষ্টান্তে শিথিলযত্ন হওযা উচিত নহে।

* * * *

"তাঁহাদের পদচিহ্ন সাক্ষ্য দিতেছে যে, তাঁহারা অতি পবিত্র, ধার্ম্মিক ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন মানব ছিলেন। তাঁহারা সংসারকে পরাজিত করিয়া পদদলিত করিয়াছিলেন।"

তাঁহাদের সমবেদনার বিস্ময়জনক শক্তিতে এবং তাঁহাদের চিন্তা ও কার্য্যপ্রণালী ভারতবাসীদিগের সহিত মিলাইবার অপূর্ব্ব ক্ষমতায়, তাঁহারা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। আপনাদের ধর্ম্মমতের মূল নীতি অব্যাহত রাখিয়া, তাঁহারা ধর্ম্মপ্রচারকদিগের ন্যায় নানা লোকের নিকট নানা ভাব গ্রহণ করিতে পারিতেন। সুনিপুণ নাবিকেরা যেরূপ সাবধানে বিপত্তিপূর্ণ স্থান পরিত্যাগ করিয়া নৌকা চালায়, তাঁহারাও সেইরূপ বলপূর্ব্বক ধর্ম্মমত-প্রচার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বদেশীয় ধর্ম্ম ও রীতি

নীতির সম্বন্ধে কিরূপ চলিতে হয়, তাহা তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ভাবী ধর্ম্ম প্রচারকগণ উচ্চতর আদর্শস্থানীয় ও মানুষের প্রধান লক্ষ্য প্রত্যক্ষবাদ ধর্ম্মের জন্য যতই একাগ্রতা প্রদর্শন করুন না কেন, ঐ অভিনব ধর্ম্মপ্রচারে প্রকৃত উৎসাহ ও আত্মত্যাগের বিষয়ে তাঁহারা সেণ্ট জেবিযর ও ডি নোবিলি অপেক্ষা উচ্চতর দৃষ্টান্তস্থল পাইবেন না।

সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত-প্রণীত

সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাস

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ

উত্তম বান্ধাই

প্রতি ভাগ ২, দুই টাকা।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। } বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী।